বুকের পাথর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BanglaBook.org

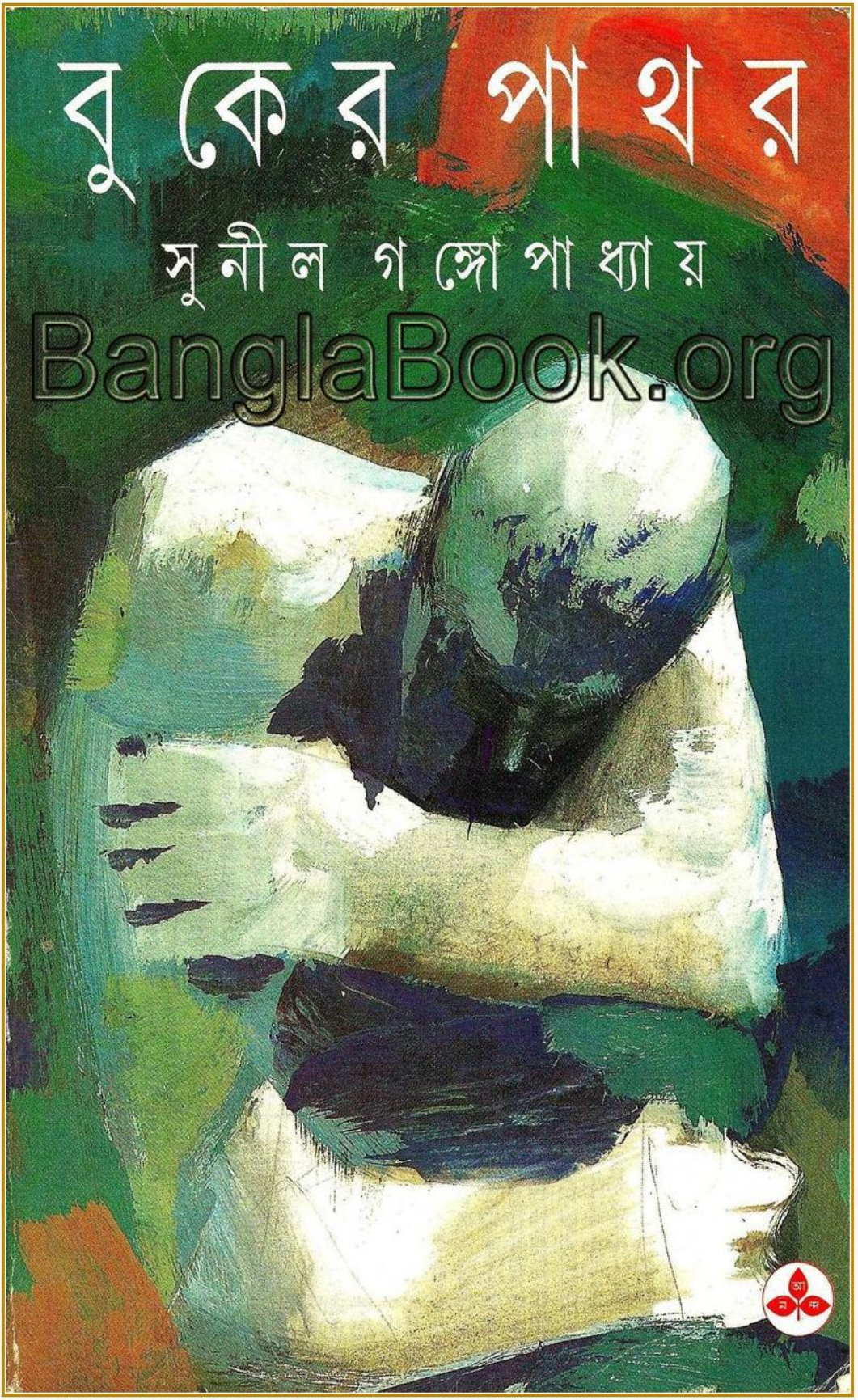

www.BanglaBook.org

আনন্দ পেপারব্যাক

বুকের পাথর

জন্ম : ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা কলকাতায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আনন্দ পেপারব্যাক

অন্যান্য বই

দুই ভারতবর্ষ • অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়মালা • অঞ্জনা দাশ
স্পর্শের বাইরে • আবুল বাসার
সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা • জয় গোস্বামী
দ্বারবাসিনী • দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছিন্ন উত্তরীয় • দুলেন্দ্র ভৌমিক
অচেনা আবেগ • দিব্যেন্দু পালিত
বরফ যখন গলে • নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নিয়তির মুচকি হাসি • নীললোহিত
বৃত্তের বাইরে • বাণী বসু
চাতক • বিমল কর
রি-ইউনিয়ন • বুদ্ধদেব গুহ
পুবের জানালা • মতি নন্দী
পাওয়া • রমাপদ চৌধুরী
জুয়াড়ি • রূপক সাহা
অসুখের পরে • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ঋণ • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ভয় • সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
অনেকেই একা • সমরেশ মজুমদার
আমাকে চাই • সমরেশ মজুমদার
দহন • সুচিত্রা ভট্টাচার্য
রূপটান • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বিকর্ণ • হর্ষ দত্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বুকের পাথর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

www.BanglaBook.org

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫

ISBN 81-7215-430-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কীম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থটি এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করা হল যে, প্রকাশকের লিখিত পূর্ব-সম্মতি ছাড়া যে-আকারে' এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অন্যরূপ বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এবং অনুরূপ ধরন ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবসা-সূত্রে বা অন্যভাবে এই গ্রন্থ ধার দেওয়া, পুনরায় বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে প্রচার করা যাবে না। সেই সঙ্গে উপরোক্ত সংরক্ষিত কপিরাইট অধীন অধিকারকে সীমায়িত না-করে পরবর্তী ক্রেতার উপর এই শর্তও আরোপ করা হচ্ছে যে, এই গ্রন্থের কপিরাইটের মালিক এবং উপরোক্ত প্রকাশক, উভয়েরই লিখিত পূর্ব-অনুমতি ছাড়া যে-কোনো পদ্ধতিতে বা যে-কোনো উপায়ে (ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল ফোটোকপিয়িং বা অন্যভাবে) এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, মজুত অথবা কোনো পুনরুদ্ধার (রিট্রিভাল) পদ্ধতিতে উপস্থাপন বা প্রেরণ করা যাবে না।

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বর্ণা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে তার রাগ। টের পাওয়া যায় তার রাগের আঁচ। শূন্য ঘর, সব জানলা বন্ধ, আবদ্ধ বাতাসে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব।

রেফ্রিজারেটারের সামনে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রজত। জুতো খোলেনি, হাতে অফিসের ব্যাগ। দরজা দিয়ে ঢুকলেই বড় হলঘরটার এক দিকে বসবার জায়গা, অন্য দিকে খাবার টেবিল। এক কোণে রেফ্রিজারেটার, তার গায়ে একটা চুম্বক দিয়ে আটকানো বর্ণার চিঠি। একমাত্র এখানে চিঠি রাখলেই সবচেয়ে প্রথমে চোখে পড়ে।

চুম্বকটা মাছের মতন, বছর দেড়েক আগে বর্ণার এক বান্ধবী এইরকম চারটে মাছ বিদেশ থেকে এনে দিয়েছিল। তারপর থেকেই ফ্রিজের গায়ে চিঠি আটকে রাখা চালু হয়েছে। অনেক সময় কোনও জরুরি কাজ মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যও কাগজে লিখে ওখানে লাগানো থাকে। বর্ণা চিঠি লিখেছে একটা কোনও ক্যাশ মেমোর উল্টো দিকে। বাড়িতে কত চিঠি লেখার কাগজ, বর্ণার নীল রঙের প্যাড আছে, তবু একটা ক্যাশ মেমোতে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি সে লিখতে গেল কেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না রজতের। বর্ণা তো এরকমই। হয়তো শুয়ে ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসেছে, কিংবা বাথরুমে স্নান করতে করতে কিছু একটা কথা মনে পড়েছে, তক্ষুনি ঠিক করেছে, তাকে চলে যেতেই হবে। যখন বর্ণার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, তখন সে আর অন্য কোনও কিছুই চিন্তা করে না। ছেলেমেয়েদের তৈরি করে নিয়েছে ঝড়ের বেগে, গুছিয়ে নিয়েছে দু-একটা ব্যাগ, তাদের হাত ধরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার কাছে গিয়ে মনে পড়েছে চিঠি লেখার কথা।

'আমি মধ্যমগ্রাম চলে যাচ্ছি। সুবু আর জাম্পি ওখান থেকেই স্কুলে যেতে পারবে। এখন তুমি মনের সুখে যা-খুশি করতে পারো।' সম্বোধন নেই, তলায় নিজের নাম নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা কিসের ক্যাশ মেমো ? রজত কাগজটা খুলে নিয়ে উল্টে দেখলো। ছ'খানা ডিনার প্লেটের একটা সেট। বেশ দামি, দু হাজার আট শো টাকা। বর্ণা এগুলো কবে কিনেছে তা রজত জানে না। প্লেটগুলো সে চোখেও দেখেনি। তিন দিন আগের তারিখ। আজকাল এক ধরনের প্যান্ট-শার্ট পরা, ইংরিজি বলা ফেরিওয়ালা বাড়িতেই এসব বিক্রি করতে আনে। সে-রকম একজনকে কয়েক দিন সে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে বটে।

তিন দিন আগে যে রমণী শখ করে খাবারের নতুন প্লেট কেনে, সে-ই আবার হুট করে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে চলে যায় ! অনেক দিনের জন্যই যে গেছে, সেটা ছেলেমেয়ের স্কুলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছে। দু'জনেরই স্কুল খোলা, দিন দশ-বারো বাদে পুজোর ছুটি শুরু হবে।

কাগজটা দলামোচা করে রজত ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে।

চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি শরীর, চওড়া বুক, মাথার চুল অর্ধেকের বেশি পাকা, প্যান্টের ভেতর শার্ট গোঁজা, গলার টাইয়ের গিঁট আলগা, মাঝারি ধরনের কৃতী অফিসার। তার ভুরু দুটি জোড়া।

পাখা খুলতে ভুলে গেছে রজত, সারা দুপুরে বৃষ্টি হয়েছে বলে ঘরের সব কটা জানলায় ছিটকিনি আঁটা, রজতের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বর্ণা অনেক সন্ধেবেলাতেই বাড়ি থাকে না, ছেলেমেয়েরা একতলায় মায়ের ঘরে গল্প করতে যায়, সেসব দিন এ ঘরটা এত নিস্তব্ধ মনে হয় না। আজ ওই চিঠিটার জন্যই একটা শূন্যতা হাঁ করে আছে।

এখন শব্দ দরকার। রজত শব্দ শুরু করল। দুমদাম শব্দে সে খুলতে লাগল জানলাগুলো। জুতো খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। হাতের ব্যাগটাকে ছুঁড়ে দিল অবহেলায়। ফ্রিজ খুলে বার করল একটা জলের বোতল। ঢক ঢক করে খানিকটা জল খাবার পর পাথরের টেবিলে দারুণ জোরে আছড়ালো বোতলটাকে। ভাঙা কাচ শুধু যে ছিটকালো চতুর্দিকে তা-ই নয়, একটা টুকরো ছিটকে লাগল তার কপালে। ভাঙা বোতলটাকে সে একটা অস্ত্রের মতন ধরে রইল, যেন সামনে কোনও নির্দয় প্রতিপক্ষ।

একতলা থেকে ভেসে এল মায়ের গলা, কী হল রে ? খোকা, কী

www.BanglaBook.org

ভাঙল ?

জোড়া ভুরু কুঁকড়ে গিয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছিল রজতের মুখ, আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো। সে বলল, কিছু না মা, একটা বোতল পড়ে গেছে।

বর্ণা মাকে বলে গেছে, না যায়নি ? ছেলেমেয়েরা ঠাকুমাকে ভালবাসে, ওরা নিশ্চয়ই দেখা করে গেছে।

বর্ণার দিদি-জামাইবাবু থাকেন গল্‌ফ গ্রিনে, দু-এক রাত ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে থেকেছে বর্ণা। আজ সেখানে সে যায়নি, তা চিঠিতে বুঝিয়ে দিয়েছে। মধ্যমগ্রামে যে রজত কিছুতেই যাবে না, তা কি বর্ণা জানে না ? গত সাত বছরের মধ্যে সে একবারও শ্বশুরবাড়িতে পা দেয়নি।

দু-তিনবার মাথা নাড়ল রজত। না, সে মধ্যমগ্রামে যাবে না, কিছুতেই যাবে না।

এবার রজত জামা-প্যান্ট, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। শাওয়ার খুলে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দভাবে। সে তার শরীরের রাগ ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বর্ণার চেয়ে রজতের ক্রোধ যে অনেকগুণ বেশি। বর্ণা হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে, সারা শরীর তার তখন ছটফট করে, দু দিন বাদে রাগের কারণটাই ভুলে যায়। রজত অসম্ভব জেদী, সে কিছুই ভোলে না। সে অবশ্য নিজের রাগটা টের পায়, সম্পূর্ণ যুক্তি হারায় না, বেশি মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই সে ইদানীং সংযত হওয়ার চেষ্টা করে। মনটা ফেরাতে চায় অন্য দিকে। এখন সে কোন দিকে মন ফেরাবে ?

গা মুছে, সারা শরীরে অনেকখানি পাউডার ছড়িয়ে রজত একটা পাজামা আর সুতির পাঞ্জাবি পরে নিল। শোবার ঘরের কাঠের আলমারি থেকে বার করল মদের বোতল। আজ তার মদ্যপানের দিন নয়। শুধু শনিবার সে বাড়িতে বসেই কিছুটা পান করে, অন্য দিন কেউ বিশেষ জোরজারি না করলে তার মদ খাওয়ার ইচ্ছে হয় না। আজ সে সুবুকে পড়াবে ভেবেছিল। অফিসে বসেই মনে হয়েছিল, ছেলের সঙ্গে তো সময় কাটানোই হয় না। সকাল থেকেই অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা থাকে, রজতকে ন'টার মধ্যে বেরুতে হয়, রাত্তিরেও ফিরতে দেরি হয় অফিস থেকে। রজতের বাবা তাকে কত গল্প শোনাতেন, রজত কি নিজের ছেলেকে কিছুই শেখাবে না ?

ভাল নাম শুভ্র, সেই থেকে সুবু। মা এই নাম রেখেছেন।

www.BanglaBook.org

ডাকনামটা বর্ণার একেবারে পছন্দ হয়নি। সে এখনও সুবুকে ডাকে রণ। বিয়ের আগে থেকেই বর্ণা ঠিক করে রেখেছিল, তার ছেলে হলে তার নাম রাখবে রণ, ডাকনাম আর স্কুলের নাম একই। কিন্তু মায়ের রাখা নাম সে মুখ ফুটে বদলাতে পারেনি। মেয়ে জন্মাবার সময় অবশ্য বর্ণার মতামত অনেক দৃঢ় হয়েছে। মা ওকে 'খুকুমণি খুকুমণি' বলে আদর করতেন। বর্ণা তখন জানিয়েছিল যে রজতের ডাকনাম খোকা, তার মেয়ের নাম খুকু হতে পারে না। ডাকতে শুরু করলে আর বদলানো যায় না। জাম্পির স্কুলের নাম সোহিনী।

মদের বোতল হাতে নিয়ে, গেলাসে ঢালার আগে, রজত দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, সুবু আর জাম্পিকে নিয়ে যাওয়ার ওর-কী অধিকার আছে!

যেরকমভাবে জলের বোতলটা ভেঙেছিল, সেইরকমভাবেই মদের বোতলটাও ভেঙে ফেলতে পারত রজত। এরকম সময় সে পয়সার কথা চিন্তা করে না। কিন্তু হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকল তাদের কাজের ছেলেটি, হারু।

সে ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলল, দাদা, তোমার জন্য নারকোলের ঘুগনি করা আছে, গরম করে দেব?

রজত বলল, না।

সে তখনই ঠিক করে ফেলল, মদ খাবে না। একা একা পান করলে তার রাগ আরও বেড়ে যাবে। বোতলটা ভরে রাখল আলমারিতে।

হারু বলল, বউদি রাত্তিরে খাবে না বলে গেছে। তোমার জন্য কী বানাব, রুটি না ভাত?

রজত বলল, কিচ্ছু না। শুধু একটু সুপ রেখে দিবি।

আরও কোনও নির্দেশের জন্য তাকিয়ে আছে হারু, রজত বলল, ঠিক আছে, নিচে যা।

বর্ণা যাওয়ার সময় কী কী বলে গেছে, বা কিছু বলেছে কি না, তা সে এখন হারুর মুখ থেকে শুনতে চায় না।

হারু চলে যাওয়ার পরই রজতের মনে হল, টেবিলের তলায় জল ও কাচের টুকরোগুলো ওকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিলে হত। কিন্তু রজত আর ডাকল না ওকে।

কপালে কাচের টুকরোটা ভাল করে বেঁধেনি, শুধু এক বিন্দু রক্ত বেরিয়েছে। চোখে লাগতে পারত।

বাথরুম থেকে একটা ঝাঁটা এনে রজত প্রথমে বড় বড় কাচের

www.BanglaBook.org

টুকরোগুলো জড়ো করল এক জায়গায়। তারপর একটা ন্যাতা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল।

বাবা একটা গল্প বলেছিলেন। কাচের টুকরোর গল্প। জানিস খোকা, এখনকার ছাত্র আন্দোলনে দেখি কথায় কথায় বোমা বেরিয়ে পড়ে। এত বোমা ওরা কোথায় পায়? কলেজের ছাত্ররাই বোমা বানায়, না কেউ ওদের বিক্রি করে? আমাদের সময় এত বোমাটোমা ছিল না, ছিল সোডার বোতল। পানের দোকানগুলোতে সাজানো থাকত অনেক সোডার বোতল, তখন শুধু শুধু সোডা খাওয়ার চল ছিল, নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকে এক বোতল সোডা খেয়ে নিত, ভাবত, তাতে বুঝি সব হজম হয়ে যাবে। আমরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পানের দোকান থেকে ঝপাঝপ সোডার বোতল তুলে নিতাম। একটু ঝাঁকানি দিয়ে ছুঁড়ে মারলে ঠিক বোমার মতন ফাটে। একরকম সোডার বোতলের মধ্যে আবার থাকত একটা কাচের গুলি, সেটা বুলেটের মতন ছুটে যেত। পরে সেরকম গুলিওয়ালা বোতল বানানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রায় প্রতি দিনই কলুটোলা আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে ছড়ানো থাকত অজস্র কাচের টুকরো। এক দিন পুলিশের তাড়া খেয়ে দৌড়োতে গিয়ে আমার পায়ের চটি খুলে গেল, খালি পায়ে সেই কাচের ওপর দিয়ে....

বাবার বাঁ পায়ের একটা আঙুল ছিল না, অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছিল। সেই সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালেও কলকাতার রাস্তায় অনেক ঘোড়ার গাড়ি চলত, ঘোড়ার গু থেকে নাকি ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। নিজেদেরই ছোঁড়া বোতল-ভাঙা কাচে পা কেটে বাবা ধনুষ্টঙ্কার রোগে মুমূর্ষু হয়েছিলেন।

তবু সেই কাটা আঙুলটার জন্য বেশ গর্ব ছিল বাবার। রজতকে দেখাতেন। সে সময় বাবাদের পার্টি ব্যান্ড, ওঁরা স্লোগান দিতেন: ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় ভুলো মাত, ভুলো মাত। দেশ আভিতক গোলাম হ্যায়, ভুলো মাত, ভুলো মাত।

বাবার কথা মনে পড়ার পরই সুবুর মুখখানা সে দেখতে পেল টেবিলের নিচে, ফ্রিজের পাশে, বাথরুমের দরজার সামনে। সুবুর বয়স এগারো বছর, সে টিনটিন পড়ে, আর্চি-অ্যাস্টারিক্স এই সব কমিক্সের পোকা, মাইকেল জ্যাকসনের গান শোনে, ঘুমে চোখ ঢুলে এলেও টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলা দেখে। সে সোডার বোতল বা বোমার বৃত্তান্ত কিছুই জানে না, স্বাধীনতা কেন আসল বা নকল হয়, তাও জানে না। অথচ সুবুর মতন বয়সেই তো রজত এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব গল্প শুনেছে।

ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর ব্যাপারে বর্ণার তীক্ষ্ণ নজর। ওদের হোম ওয়ার্ক ঠিক হচ্ছে কি না কিংবা ক্লাস টেস্টে কী রেজাল্ট হচ্ছে, তা সে নিয়মিত দেখে, ওসব ব্যাপারে রজতের যেন মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা শুধু ভাল রেজাল্ট করবে, তারা আর কিছু জানবে না ? জানিস সুবু, এবার থেকে তুই আমার কাছে মাঝে মাঝে পড়তে বসবি। স্কুলের বই থেকে পড়তে হবে না, আমি তোকে অন্য বই পড়াব, অনেক গল্প বলব, জেলখানার ভেতরটা কেমন দেখতে হয় জানিস ? সুবু, তুই কি জানিস, তোর বাবা তিন বছর জেল খেটেছিল, এমন কি তোর বাবার ফাঁসিও হতে পারত ?

ন্যাতা দিয়ে জল মুছতে মুছতে রজত বলল, বর্ণা, ছেলেমেয়েদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমার ভেতরে জানোয়ার আছে, তা তুমি এখনও টের পাওনি, সে যদি একবার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে—

রজত নিজেও সেই জানোয়ারটাকে দারুণ ভয় পায়। একা থাকলেই হঠাৎ হঠাৎ তার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, খিমচে ধরে নিজের বুক, এ দিক ও দিক চোখ ঘোরায়, নিশ্বাস ফেলে ড্রাগনের মতন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে, প্রায় ছুটে রজত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, চলে এল একতলায় তার মায়ের কাছে। মায়ের পাশে বসলে তার নিশ্বাস নরম হয়ে আসে, বন্ধ হয়ে যায় বুকের তোলপাড়।

মেঝেতে বসে মা ক্যারাম খেলছেন শান্তিপিসির সঙ্গে।

কলেজ থেকে মা রিটায়ার করেছেন পাঁচ বছর আগে। বাবা যখন বেঁচেছিলেন, রজতের মনে আছে, দু'জনে প্রায়ই প্ল্যান করতেন রিটায়ার করার পর তাঁরা কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবেন। বাবার ইচ্ছে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে দেখার। ব্রাজিল, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সানসালভাদর ; মা বলতেন ওসব না, আগে হিমালয়। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে কৌশানিতে ছোট একটা বাড়ি কিনব, তারপর সেটাকে সেন্টার করে ঘুরব সব দিকে।

বয়স্করাও কত ছেলেমানুষ হয় ! ওঁরা তখন ভাবেননি যে রিটায়ার করার পর সাধারণত মানুষের হাঁটু কমজোরি হয়ে যায়, সিঁড়ি ভাঙলে বুক ধড়ফড় করে, প্রতি দিনের রুটিনের বাইরে যেতে মন চায় না। বাবা চলে গেছেন রিটায়ার করার এক বছর আগে। রজত প্রায়ই আপন মনে বলে, বাবা, তুমি কেন দক্ষিণ আমেরিকা দেখতে গেলে না, আমি তোমাকে টাকা দিতাম, এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েও তুমি

www.BanglaBook.org

যেতে পারতে, তোমার এত শখ ছিল.... । বাবা, তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই নাওনি !

মায়ের হাঁটুতে এমন বাত যে দোতলায় উঠতেও কষ্ট হয়, তাই তিনি একতলায় নেমে এসেছেন। ভাগ্যিস শান্তিপিসিকে পাওয়া গেছে। বাবার পিসতুতো বোন এই শান্তিপিসি থাকতেন বেনারসে, একটি মাত্র ছেলে, অমানুষ। তার বউ শাশুড়ির গায়ে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিত, পেট ভরার মতন ভাত খেতে দিত না। এখন মায়ের সঙ্গিনী হয়ে দু'জনেই বেশ ভাল আছেন। তবে বেচারি শান্তিপিসি ক্যারাম খেলতে একেবারেই পারেন না, বারবার হারেন। শুধু ক্যারাম নয়, মা একসময় ব্যাডমিন্টন খেলাতেও প্রাইজ পেয়েছিলেন।

রজতকে দেখেই শান্তিপিসি বললেন, আয় খোকা, তুই এবার একটু খেল তো বাপু ! আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে !

রজত ঝুপ করে বসে পড়ে বলল, মা, খেলবে আমার সঙ্গে ? কত বাজি ?

মা মুখ তুলে চেয়ে হাসলেন। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, পারবি না, পারবি না !

রজত বলল, তিন বোর্ড খেলব, কত বাজি বলো !

মা বললেন, যদি দু বোর্ড জিততে পারিস, দশ টাকা দেব।

রজত বলল, অত কমে হবে না। এক শো টাকা।

সকালবেলা অফিস যাওয়ার সময় রজত মাকে অঝোর নয়নে কাঁদতে দেখেছিল !

বর্ণার সঙ্গে মায়ের কখনও ঝগড়া হয় না। যদিও রজত জানে, বর্ণা কোনওদিনই তার মাকে নিজের মায়ের মতন ভালবাসতে পারবে না। বরং শাশুড়ি সম্পর্কে তার মনে একটা বিরাগের ভাবই আছে। শাশুড়ি তার চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানেন, তিনি কখনও চেঁচিয়ে কথা বলেন না, কাজের লোকদের বকাবকি করেন না, এই সবই অনেক সময় তাচ্ছিল্যের কারণ হয়। কেউ যদি ভাল হয়, তা হলে সেই ভালোত্বটাই এক-এক সময় অসহ্য লাগে। কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বর্ণা এক-এক সময় রজতকে ঠেস দিয়ে বলে, যাও না, তোমার ইনটেলেকচুয়াল মায়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে এস।

মায়ের কাছে রীতিসম্মত সৌজন্যের ভাব দেখাতে বর্ণা অবশ্য কখনও ত্রুটি করেনি। সেটাও তো যথেষ্ট। তা দেখেই শান্তিপিসি বলেন, হিরের টুকরো বউ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মায়ের কাছ থেকে এক-এক দিনের খবরের কাগজ লুকিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছে রজত। কিন্তু কাগজ পড়া যে মায়ের নেশা। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে বীভৎস খুন-খারাপির খবর থাকলে মা কান্নাকাটি করবেনই। দিনদিনই এটা বাড়ছে। এরকম খবর তো প্রায়ই থাকে। আজকের কাগজে আছে, আসামের একদল উপজাতীয় উগ্রপন্থী একটা রিফিউজি ক্যাম্পে এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মেরে ফেলেছে ছাব্বিশ জনকে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে অসহায় নারী ও শিশু।

মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ওরা জানতেই পারল না কেন ওরা মরছে! কী ওদের অপরাধ! কেন মানুষ এভাবে মানুষকে মারে?

এই সব সময়ে রজত মাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। সকালে তার অফিসে যাওয়ার তাড়া থাকে, যাওয়ার সময় শুধু একবার একতলার এ ঘরে উঁকি মেরে বলে যায়, মা যাচ্ছি! ছেলেবেলা থেকেই রজতের এরকম অভ্যেস। শুধু দুবার না তিনবার, ঠিক তিনবার সে মাকে কিছু বলে যেতে পারেনি!

লাল গুটিটা পকেটে ফেলে দিয়ে সে মায়ের দিকে সগর্বে তাকাল। সে সাদা নিয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটা কালো গুটি খতম। পরের বারটা তার ফসকে গেল।

মা বললেন, তুই কিছুই খেলা শিখিসনি খোকা। ভাল ভাল খেলায় কী হয় জানিস, স্ট্রাইকার ছাড়তে নেই। একবার স্ট্রাইকার অন্য হাতে দিলেই, ব্যস, গেল! এইবার খেলা দ্যাখ।

রজত অনেকদিন খেলেনি মায়ের সঙ্গে। রিটায়ার করার পর বাড়িতে বসে বসে মা আরও হাত পাকিয়েছেন। তা বলে এতটা? রজতের চোখ ঠিকরে আসার উপক্রম। মা ধরে ধরে সব কটা গুটিই ফেলে দিলেন একবারে।

তারপর শান্তিপিসির দিকে তাকিয়ে বললেন, ছেলের কাছ থেকে আজ একশো টাকা রোজগার করছি, ঠাকুরঝি। কাল আমরা রাবড়ি খাব।

রজত বলল, অত সহজে নাকি? দ্যাখো না পরের বোর্ডে কী করি! একটু পাউডার লাগবে। হরলিক্স কোথায় গেল? এক কাপ চা খেলে মন্দ হত না।

শান্তিপিসি বললেন, আমি চা করে আনছি।

মা এবার ফাটিয়ে তিনটি গুটি ফেললেন। তারপর তাঁর ফাইন

www.BanglaBook.org

হল। স্ট্রাইকারটা রজতের হাতে দিতে দিতে তিনি বললেন, বর্ণা হঠাৎ এ সময় বাপের বাড়ি চলে গেল কেন ?

রজত জিজ্ঞেস করল, তোমায় কিছু বলে যায়নি ?

মা বললেন, হ্যাঁ, বলল তো কয়েকদিনের জন্য যাচ্ছে মধ্যমগ্রামে। ওর সেই ছোট ভাইয়ের বিয়ের কথা শুনছিলাম, সেই জন্য নাকি ?

রজত বলল, মা, তুমি ভুলে গেছ, ওর ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে গত মাসে। এখন এমনিই গেছে। কবে ফিরবে তুমি জিজ্ঞেস করোনি ?

মা বললেন, বর্ণাকে জিজ্ঞেস করিনি। সুবুকে বলেছিলাম, কবে ফিরবি রে ? সুবু বলল, আমি কালকেই ফিরে আসব।

বর্ণা চিঠিতে লিখে গেছে অন্য কথা। রজত তা জানাল না। সুবু কি একা ফিরতে পারবে ?

মা বললেন, হ্যাঁ রে খোকা, বর্ণার সঙ্গে আজ তোর কিছু নিয়ে মন-কষাকষি হয়েছে নাকি ? কেমন গম্ভীর দেখলাম।

রজত বলল, না, সেরকম কিছু হয়নি।

কথাটা মিথ্যে নয়। আজ কিংবা গতকালও বর্ণার সঙ্গে রজতের কোনও ব্যাপারে রাগারাগি কিংবা কথার ধারালো তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়নি। তবে বর্ণা কেন আজ চলে গেছে তা রজত জানে। সে অনেক পুরনো ব্যাপার।

মা বললেন, তোর বাবার সঙ্গে আমার যখন ঝগড়া হত, আমার তো বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার উপায় ছিল না, মা-বাবা থাকতেন এলাহাবাদে। তিনতলায় যে ছোট্ট ঘরটা আছে, সেখানে গিয়ে আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতাম। তোর বাবা ওই ঘরটার নাম দিয়েছিল গোঁসা ঘর।

রজত বলল, তোমাদের ঝগড়া হত ? কখনও দেখিনি তো !

মা বললেন, হবে না ? সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়। একজোড়া নারী-পুরুষ, সব সময় একসঙ্গে, মতের তফাত হবে না, রুচির তফাত হবে না, তা কি সম্ভব ? বিয়ে জিনিসটাই তো নতুন, মাত্র কয়েক হাজার বছরের ব্যাপার, মানুষ এখনও মেনে নিতে পারে না সব সময়, দেখিস না কত বিয়ে ভাঙছে !

রজত বলল, মা, তুমি বাবাকে সবচেয়ে খারাপ ভাষা কী বলেছ ?

মা বললেন, বলেছি হৃদয়হীন। সত্যি তোর বাবা কিছুটা হৃদয়হীন ছিলেন। পলিটিকসের দিকে খুব ঝোঁক ছিল তো, সমস্ত দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা উজাড় করে দিতে চাইতেন, বাড়ির মানুষদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকত না। যেবারে তোর দিদির খুব অসুখ, আমি সব দিক সামলাতে পারছি না, সেবারেও তোর বাবা হায়দরাবাদ কনফারেন্সে যোগ দিতে চলে গেলেন। তবু কি জানিস, ওই 'হৃদয়হীন' কথাটা বললেই উনি খুব আঘাত পেতেন, মুখটা কালো হয়ে যেত। এক-এক সময় ওঁকে আঘাত দিয়ে আমার খুব আনন্দ হত!

রজত বলল, আমার মনে হচ্ছে, মা তুমি বানিয়ে বলছ এইসব কথা। বাবা আমাদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন।

মা বললেন, হ্যাঁ বাসতেনই তো। তবে পার্টটাইম ভালবাসা। মাঝে মাঝেই তো উধাও! তুইও তোর ছেলেমেয়েকে ভালবাসিস, কিন্তু তারা কতক্ষণ তোকে কাছে পায়?

বাঁ দিকের পকেটের কাছে একটা গুটি বুড়ো আঙুলের টুসকি দিয়ে ফেলতে ফেলতে রজত মনে মনে বলল, আজ থেকেই ঠিক করেছিলাম সুবুকে নিয়ে বসব, চয়নদের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, না গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম, বর্ণাই ছেলেমেয়েদের আমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখে....

মা বললেন, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হয়, হবেই মাঝে মাঝে, তবে ছেলেমেয়েদের সেটা না শোনানোই ভাল।

শান্তিপিসি চায়ের ট্রে নিয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে জিতল? কে জিতল?

পরপর দু বোর্ড মা জিতেছেন। তৃতীয় বোর্ডে লাল গুটিটা রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

ঠিক সমবয়সীর মতন মা একটু ঝুঁকে এসে রজতের থুতনি ধরে বললেন, কী চাঁদু, আর বাজি ফেলবে আমার সঙ্গে?

ছেলে বলে ছাড়ানছুড়িন নেই। বাজি হচ্ছে বাজি। এটা তো ছেলেখেলাও নয়। মা হাত পেতে বললেন, কই, টাকা দে, ধার চলবে না।

রজত পাট-ভাঙা পাঞ্জাবি পরেছে, পকেটে কিছু নেই, ওপরে গিয়ে টাকা আনতে হল।

মা বললেন, একটু ধর তো আমাকে।

যাঁর হাতের আঙুল এমন লঘু ও ক্ষিপ্র, তাঁর হাঁটুতে একেবারেই জোর নেই। মেঝেতে বসলে টেনে তুলতে হয়। রজত মাকে দাঁড় করাল। বেশ টুকটুকে ফরসা রঙ, পাতলা, লম্বাটে গড়ন, মাথায় অনেক চুল। রজতের তুলনায় তার মায়ের অনেক চুল এখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালো। নীল পাড়, সাদা শাড়ি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

আলমারি খুলতে খুলতে মা আপনমনে বললেন, এটা বাজির টাকা, এটা দিয়ে কাল রাবড়ি খাওয়া হবে।

আর একটা একশো টাকার নোট আলমারি থেকে বার করে বললেন, কাল 'টেলিগ্রাফ' কাগজে একটা বইয়ের রিভিউ দেখলাম, টনি মরিসনের 'বিলাভেড'। তুই পড়েছিস, খোকা ?

রজত মায়ের মতন অত পড়ুয়া নয়। বিদেশি গল্প-উপন্যাস পড়ার সময় বা আগ্রহও তার নেই। সে বলল, না পড়িনি বইটা।

মা বললেন, বইটা পড়িসনি তা জানি। রিভিউটা পড়েছিস ? আমি তো কত বইয়ের রিভিউ শুধু পড়ি, বইগুলো চোখেও দেখি না। এটা মনে হল, কালো লোকদের নিয়ে লেখা, খুব জোরালো। সেই যে দুটো কালো মেয়ের গল্প পড়েছিলাম, 'দা কালার পারপ্‌ল', তুই দ্যাখ তো এই 'বিলাভেড' বইটা এখানে পাওয়া যায় কি না, আমার জন্য একটা কিনে আনিস।

দ্বিতীয় একশো টাকার নোটটা ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, এর থেকে যদি বেশি লাগে, আমাকে বলবি।

অন্যদিন রজত অফিস থেকে ফেরার পর দোতলাতেই থাকে। দুটো-একটা কাজের কথা বলার দরকার না হলে তো মায়ের ঘরে আসাই হয় না। আজ একবার তার হঠাৎ ইচ্ছে হল, মায়ের কোলে মাথা রেখে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের পর সে আর কোলে শোয়া অবস্থায় মায়ের মুখখানা দেখেনি। সেই বয়েসেও সে ছটফট করত, মা এক-এক দিন জোর করে তাকে শোওয়াতেন। মায়ের বুকের গন্ধ সে ভুলে গেছে। অবশ্য নিশ্চয়ই বদলে গেছে গন্ধ। মাতৃগন্ধ কি চিরকাল এক থাকতে পারে ? মা তখন রঙিন শাড়ি পরতেন, পারফিউম মাখতেন, জর্দা পান খেতেন। তা ছাড়া আমিষ-নিরামিষের একটা তফাত আছে না !

বাবার মৃত্যুর পরেও মা মাছ-মাংস খেতেন, রজত প্রথম থেকেই জোর করেছিল, মায়েরও বিশেষ আপত্তি ছিল না। মা ইতিহাসের ছাত্রী ও অধ্যাপিকা। সংস্কার ও লোকাচার ছাড়িয়ে তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু বিচার করতে পারেন। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। সমস্ত ইতিহাসই তো খুনোখুনিতে আকীর্ণ, এক-একটি জাতি বা গোষ্ঠী অন্য জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চেয়েছে নৃশংসতম উপায়ে, সেই রক্ত নদীর ওপর দিয়েই এগিয়ে গেছে সভ্যতা। কিন্তু এই ইতিহাসের

www.BanglaBook.org

অধ্যাপিকাটি বর্তমানের কোনও গণ সঙ্ঘর্ষ বা নরহত্যার খবরও সহ্য করতে পারেন না।

শান্তিপিসি আসার পর মা-ও নিরামিষ খেতে শুরু করেছেন। শান্তিপিসি কাশীর বিধবা, তাঁকে কোনও রকম আমিষ ছোঁওয়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। পেঁয়াজ-রসুনও আমিষের দলে। আলু বা মুলো কেন নয়, তার কোনও উত্তর নেই। মুলোরও তো বেশ ঝাঁঝ আছে! পাঞ্জাবিরা মটর-পনিরের মতন নিরামিষ তরকারি রসুন দিয়ে কী চমৎকার রাঁধে, একথা রজতের মুখে শুনলেই শান্তিপিসি শিউরে উঠে নাকে কাপড় দেন।

রজত অবশ্য নিরামিষ লাউঘণ্ট বা পলতা পাতার বড়া-ভাজা বেশ পছন্দই করে। মাঝে মাঝেই সে মায়েদের ঘরের রান্না চেয়ে পাঠায়।

সুবু আর জাম্পির জন্য খুব মন কেমন করছে রজতের। তাই কি মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকার ইচ্ছে হলো? এতকাল পর আর সেটা সম্ভব নয়। পাশে বসে থাকা যায় নিশ্চয়ই। ভূতের ভয় পাওয়া বয়সের মতন গুটিসুটি মেরে, মায়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে, পুরোনা কালের গল্প শুনবে অনেকক্ষণ, নিরামিষ-ঘরে খাবে।

এসব ইচ্ছে কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার বিলাসিতার মতন। মিনিট পাঁচেকের বেশি টেঁকে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রজত বললো, মা, আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে। আমি সদরের চাবি নিয়ে যাচ্ছি।

মোটর বাইকটা সে বার করলো রাস্তায়। মাথায় হেলমেট দিল। পাজামা পরে সে কখনো বাইক চাপে না, কিন্তু এখন পোশাক বদলাবারও সময় নেই, তার এত তাড়া। মোটর বাইকের স্পর্ধার মতন গর্জনে বেশ স্বস্তি বোধ করলো সে। এই শব্দ যেন মাতৃ-সাহচর্যের ঠিক বিপরীত। এখন সে একা, চুয়াল্লিশ বছরের এক যুবা।

অফিসের গাড়ি রজতকে নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়, মোটর বাইক মটমটিয়ে অফিস যাবার মতন চাকরি সে করে না, তার চেয়ে বেশ উঁচু। মোজা ছাড়া জুতো পরা যায় না, ঠিক ঠাক টাইয়ের গিঁট বাঁধতে হয়, চেঁচিয়ে কথা বলা চলে না, কথাবার্তা নিচু স্কেলে বাঁধা থাকে। অফিসে যত তুমি ধীর স্বরে কথা বলবে, তত বোঝা যাবে তোমার চিন্তার গভীরতা আছে।

মোটর বাইকটা রজত ব্যবহার করে ছুটির দিনে। জাম্পি জন্মাবার আগে এটা কিনেছে। সুবু আর বর্ণাকে নিয়ে কতবার এই মোটর

www.BanglaBook.org

বাইক চালিয়ে সে কাছাকাছি বেড়াতে গেছে। একবার এই বৃষ্টির দিনে কোলাঘাটে, বর্ণা বলেছিল, এই বম্বে রোড সোজা বম্বে পর্যন্ত গেছে ? চলো না, বম্বেতেই চলে যাই, কতদিন লাগবে ? সাড়ে চার বছরের সুবু হাততালি দিয়ে বলেছে, বম্বে, বম্বে !

ছেলে আর মেয়ে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে, স্ত্রীকে পেছনে বসিয়ে এখন মোটর বাইক চালানোটা ঝুঁকি-জনক। তাই অনেক দিন সপরিবারে বেরুনো হয় না। এটা বিক্রি করে দিয়ে একটা গাড়ি কেনার কথা প্রায়ই বলে বর্ণা। পূজোর সময় কেনা যেতেও পারে। বর্ণা কি ট্যাক্সিতে গেল মধ্যমগ্রাম, না ওর বাপের বাড়ির কেউ গাড়ি এনেছিল ?

নির্দিষ্ট কোথায় যাবার নেই রজতের, তবু তার খুব তাড়া। নিজে থেকে সে কোনও বন্ধুর বাড়িতে যায় না, এটা সবাই জেনে গেছে। ক্লাব-লাইফও তার পছন্দ নয়। অফিসের কাজ, অফিস ছুটির পরেও অফিসের কাজ, ফিনান্স দেখতে হয় তাকে, ইনকাম ট্যাক্স ল-ইয়ারের বাড়িতে তাকে প্রায়ই হাজিরা দিতে হয়। বুনো শুয়োরের মতন গোঁয়ার্তুমি নিয়ে চাকরির উন্নতির একমুখী দিকে ছুটছে রজত। অন্তত সকলেই তো সে রকমই মনে করে।

মোটর বাইকে আপাতত তার কোনও নির্দিষ্ট দিক নেই। তেলের কাঁটাটা একবার দেখে নিয়ে রজত পার্ক সার্কাস দিয়ে চলে এলো ইস্টার্ন বাইপাসে। ফাঁকা রাস্তায় গতি বাড়িয়েই চললো। বাতাসে ফুঁসে উঠেছে তার পাঞ্জাবি, পাজামা পায়ের কাছে পতপত করছে, মুখে বিঁধছে বাতাসের সূচ, চোখ দুটি তীব্র, স্থির। বিজ্ঞাপনের ছবিতে যেমন থাকে, মোটর বাইক হঠাৎ একটি চিতা বাঘ হয়ে গিয়ে জল-কাদা পেরুবার জন্য লাফ দেয়, রজতও যেন সে রকম আক্রমণে-উদ্যত, যদিও তার সামনে কোনও প্রতিপক্ষ নেই।

এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে রজতের হুঁশ হলো। এখান থেকে মধ্যমগ্রাম বেশি দূর নয়, রজত সেখানে যাবার কথা একবারও ভাবেনি, সেখানে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, বর্ণা নিজেও তা আশা করে না, সে জানে। ফাঁকা রাস্তা বলেই রজত এদিকে এসেছে। গতি না কমিয়েই সে মোটর বাইকটা ঘুরিয়ে নিল।

রাস্তা দেখছে না। অন্য গাড়ির দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। অন্ধের মতন চালাচ্ছে রজত। যেন সে একটা ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে। আবার যখন তার খেয়াল হলো, তখন সে এসে পৌঁছেছে ডায়মণ্ড হারবার রোডে। তা হলে চিন্তা না করলেও একটা চিন্তা থাকে। রজত মনে

www.BanglaBook.org

মনে হারিয়ে গিয়েছিল, তবু সে এখানে এলো কেন ? এটা তার পক্ষে বিপজ্জনক এলাকা।

একবালপুরের মোড়ে মোটর বাইকটা থামালো রজত। পাশের একটা দোকান থেকে কাবাব সেঁকার বেশ মনোরম গন্ধ আসছে। একা একা কোনও দোকানে ঢুকে কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই। বর্ণা কাবাব ভালোবাসে, অন্য দিন হলে রজত কিছুটা কিনে নিয়ে যেতে পারতো। রজত একটা সিগারেটের প্যাকেট কিনে ধরালো।

একটু দূরে বস্তির পাশ দিয়ে একটা রাস্তা। সবই বস্তি নয়, মাঝে মাঝে পাকা বাড়িও রয়েছে। রজত মাঝে মাঝে আড় চোখে ওই রাস্তাটা দেখছে। সে ওখান দিয়ে একবার যাবে, কি যাবে না ? কেউ তাকে চিনে ফেলতে পারে। চিনলে তার ফল ভাল হবে না। যাবে কি যাবে না রজত ? মোটর বাইক চিতাবাঘ হয়ে মাঝে মাঝে লাফ দেয়। রজত আবার স্টার্ট দিল। বস্তির পাশের রাস্তাটায় ঢুকে পড়ে মুখ নিচু করে রইলো, সে কিছু দেখছে না, কেউ তার মুখ দেখতে পাবে না।

একটি দোতলা বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে সে একবার চকিতে মুখ তুলে তাকালো একটা জানলার দিকে। এমনও হতে পারতো, সেই ঘরে জ্বলছে আলো, জালনার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী, তার চুল খোলা, তার দু' চোখে জলের ধারা।

রজত মনে মনে তৈরি করেছিল এই ছবি। কিন্তু সে রকম কিছুই নেই। জানলাটা বন্ধ।

॥ ২ ॥

বিবাহিত জীবন যাপন করা যে এক বিষম শক্ত ব্যাপার, সে সম্পর্কে রজতের কোনও ধারণাই ছিল না।

নিজের বাবা-মাকে দেখে কখনও তার মনে হয়নি, তাঁরা সংসার রচনা করে কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন। বেশ সরল, হাল্‌কা জীবনই তো ছিল।

দিদির পরপর জনডিস ও টাইফয়েড হবার পর শরীরটা খুব ভেঙে পড়েছিল, বাবা তখন সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। এক সঙ্গে বেড়াতে যাবার সেই একটিই স্মৃতি আছে রজতের, এ ছাড়া মায়ের সঙ্গে কাশী আর এলাহাবাদ গেছে কয়েকবার, কিন্তু বাবা তখন থাকতেন না। সেবার যাওয়া হয়েছিল অনেক দূরে, দক্ষিণ ভারতে,

www.BanglaBook.org

রজত তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে।

বাবার চাকরিটা ছিল এলেবেলে ধরনের। পরাধীন আমলে স্বদেশী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল একটি ওষুধ কোম্পানি, প্রথমে ছিল কো-অপারেটিভ, পরে সেটি ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়ে বেশ উন্নতি করে, বাবা সেখানে ছিলেন একজন ছোটখাটো কর্মচারি। সেখানে কাজ বিশেষ কিছু করতেন না, বরং পার্টির কাজে ঘোরাঘুরি করতেন প্রচুর, প্রায়ই চলে যেতেন কলকাতার বাইরে। অত ছুটি কোনও অফিসে পাওয়া যায় না, কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব স্নেহ করতেন, বাবার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ প্রশ্রয়, তাই চাকরিটা শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। চাকরির ব্যাপারে মা ছিলেন খুব মনোযোগী, কলেজ থেকে পারতপক্ষে ছুটি নিতেন না, বাড়িতেও ছাত্র-ছাত্রী পড়াতেন, মায়ের উপার্জন ছিল বাবার চেয়ে বেশি। বাবা বলতেন, আমি যে বাড়ি ভাড়াটা বাঁচিয়ে দিচ্ছি! মধ্য বয়সে বাবা তাঁর দিদিমার সম্পত্তি থেকে এই বাড়িটা পেয়েছিলেন। হোক না ছোট বাড়ি, তবু তো নিজস্ব বাড়ি।

সেবার যাওয়া হলো মাদ্রাজ, মহাবলিপুরম, পণ্ডিচেরি ...। প্রতি দিনের রুটিন বাঁধা জীবন থেকে বাইরে গেলেই সম্পর্কের রঙগুলো স্পষ্ট হয়। রজতের তখন মনে হয়েছিল, তার আর দিদির জীবন ঘিরেই যেন মা আর বাবার জীবন আবর্তিত। ট্রেনে যেতে যেতে এক একটা প্রদেশ পার হবার সময় বাবা বুঝিয়ে দিতেন কোথাকার প্রকৃতির কী তফাত, গাছপালাগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে, মা শোনাতেন টুকরো টুকরো ইতিহাস। তবে শুধু ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে জ্ঞানের কথাই হত না, আরও কত মজা, ভুবনেশ্বর স্টেশনে দিদির হাত থেকে ওষুধের কৌটো পড়ে গেল, ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে, বাবা লাফ দিয়ে নেমে গেলেন, ওষুধের কৌটোটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটতে লাগলেন ট্রেনের সঙ্গে সমান্তরালে, হ্যান্ডেলটা ধরতে পারছেন না, কয়েকজন সহযাত্রী চেন টানবার জন্য চেঁচামেচি করছিল, শেষ পর্যন্ত ঠিক উঠে এলেন বাবা। মা তখন বাবার দিকে যেভাবে তাকিয়েছিলেন, রজত সেই দৃষ্টিটা কোনও দিন ভুলবে না। দু'জন মানুষের যে পারস্পরিক গভীর নির্ভরতা, নীরব বোঝাবুঝি, তার নামই তো দাম্পত্য।

সেই বয়সে সব কিছুই রোমাঞ্চকর, নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনায় মন ভরে থাকে। সব স্মৃতিই মধুর, তবু পরবর্তী কালে একটা ছোট কাঁটা রজতের মনে খচখচ করত, তখন সে কাঁটাটা চিনতে পারেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহাবলিপুরমে ওরা উঠেছিল একটা ধর্মশালায়। বাবা খুঁজে খুঁজে সস্তার হোটেল কিংবা ধর্মশালা বার করতেন। তা ছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই তাঁর পার্টির লোক বা তাঁদের কোনও আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া যেত, তাঁরা দেখাশুনো করতেন। হাওয়া পরিবর্তনে দিদির খুব উপকার হয়েছিল, চাঙ্গা হয়ে উঠছিল বেশ, কিন্তু মহাবলিপুরমে বাবা নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার বরাবরই একটু হাঁপানির টান ছিল, এক দিন বৃষ্টিতে ভিজে সেটা বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে জ্বর আর পেটে ব্যথা। সনৎ নামে একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, তিনি ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করলেন, অনেক সাহায্য করেছিলেন মাকে।

বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না, রজতদেরও ধর্মশালার বাইরে বেরুনো হয় না। মহাবলিপুরমে মাত্র চার দিন থাকার কথা, তারপর পণ্ডিচেরি যাবার জন্য বাসের টিকিট কাটা আছে, সেইদিন না গেলে ওরা টিকিটের টাকা ফেরত দেবে না, সহজে আর টিকিটও পাওয়া যাবে না, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে ফিরতেই হবে।

প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যেও বাবা মাকে ডেকে বললেন, বিনতা, এখানে এসেও তোমাদের কিছু দেখা হবে না, তা কি হয়! এখানে কত মন্দির, কত স্কাল্পচার, হিস্টোরিক্যালি এত ইম্পর্টান্ট জায়গা, তুমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাও লক্ষ্মীটি, আমি ঠিক থাকতে পারবো, সনৎ তোমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

মা প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু বাবা বারবার বলতে লাগলেন ওই এক কথা।

দিদি তখন বললেন, আমি থাকবো বাবার কাছে, মা তোমরা যাও। আমার অত মন্দির-টন্দির দেখতে ভালো লাগে না।

মেয়েরা নাকি মায়ের চেয়ে বাবাকে বেশি ভালোবাসে, দিদি সত্যিই ছিল বাবার অন্ধ ভক্ত। মা কখনও বাবাকে এমনি কৌতুকের ছলে একটু খোঁচা মেরে কথা বললেই দিদি অমনি ফোঁস করে উঠত। দিদি রয়ে গেল। রজত তখন বাবার অসুখকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, অসুখ সবারই হয় মাঝে মাঝে, আবার সেরে যায়। সে ছটফট করছিল বাইরে যাবার জন্য। তাকে টানছিল সমুদ্র। তাদের ধর্মশালা থেকে সমুদ্র অনেক দূরে।

সেখানে নানা রকমের গাইডরা এসে টানাটানি করে, কিন্তু সনৎই তাদের গাইড, সে সব চেনে। সনৎ লাইট হাউসে কাজ করে, সমুদ্রের জাহাজদের আলো দেখায়।

www.BanglaBook.org

অনেক কিছু দেখা হলো। যেখানে সমুদ্রের কিনারে একটা মন্দির কাত হয়ে আছে, তার কাছাকাছি একটা মেলা বসেছে, সেখানে ঘুরছে একটা নাগরদোলা। রজত সেই নাগরদোলায় চাপার বায়না ধরেছিল। অল্প বয়সে এরকম হয়, আসল ব্যাপারের চেয়ে অন্য ছোটখাটো দিকে মন চলে যায়। তখনও সমুদ্রের কাছাকাছি যায়নি, সমুদ্রের জলে পা ডোবায়নি, নাগরদোলাটাই তাকে বেশি টানলো।

মা রজতকে দুটো টাকা দিলেন। নাগরদোলা দশ পাক ঘোরালে এক দান, সেই এক-এক দানের জন্য এক টাকা লাগে। দু-একটা ছেলেমেয়ে একেবারে ওপরে ওঠার সময় ভয়ে হাউ-মাউ করে, রজত যে ভয় পায় না সেটা সে মাকে দেখাতে চেয়েছিল। মা ছিলেন না সেখানে।

কুড়ি পাক ঘুরে নেমে আসার পরও রজত মাকে সেই মেলায় দেখতে পেল না। বেশ খানিকটা দূরে, বেলাভূমির একেবারে প্রান্ত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন মা আর সনৎকাকা। মা শাড়িটা একটু উঁচু করে ধরেছেন, তাঁর পায়ে এসে লাগছে ঢেউ, আঁচলটা উড়ছে নৌকোর পালের মতন, বালিকার মতন মা লাফাচ্ছেন মাঝে মাঝে, একবার পড়ে যাচ্ছিলেন, সনৎকাকা তাঁর হাত ধরলেন।

খুব তো দূরে নয়, রজত এক ছুটে সেখানে চলে যেতে পারত। তবু সে গেল না। কেন ? কিছুটা অভিমান হয়েছিল, কিন্তু তা কিসের জন্য ? মা তার নাগরদোলায় চাপার বীরত্ব দেখেননি বলে ? রজত একা একা মন্দিরের ধার ঘেঁষে সমুদ্রে নেমে হাফ প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললো। সে জন্য পরে ফিরে এসে মা যখন তাকে বকুনি দিলেন, তখনও সে একটাও কথা না বলে ঘাড় গোঁজ করে ছিল।

এই ঘটনাটির প্রকৃত মর্ম রজত বুঝেছিল অনেক দিন পর, ইতালিতে, ভূমধ্যসাগরের তীরে। একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে একটা ঝিনুক মুখে পুরে দিয়ে প্রায় মরতে বসেছিল, তার বমি ও আর্ত চিৎকারে ছুটে এসেছিল অন্য স্নানার্থীরা, তার মা সেখানে ছিল না। তার মা তখন সমুদ্রে অনেকখানি নেমে গিয়ে গ্রিক দেবতার মতন একজন সুপুরুষের সঙ্গে কৌতুক করছে। ওই লোকটি যে রমণীটির স্বামী নয় তা রজত জানে। আগে দু-তিন দিন রমণীটিকে কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়া শুধু নিজের মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে দেখা গেছে। ওসব দেশে এরকম অনেক স্বামী-বিচ্ছিন্না মেয়েই একা একা সন্তান পালন করে। এই মহিলারও নিজের মেয়ের প্রতি স্নেহ বা আদিখ্যেতার কোনও অভাব দেখা যায়নি। শুধু সেই একদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের জন্য মেয়ের কথা ভুলে গিয়েছিল। তারই মধ্যে মেয়েটা ঝিনুক খেয়ে ফেলে মুমূর্ষু অবস্থা।

কোনও রমণীই সর্বক্ষণের জন্য শুধু জননী কিংবা স্ত্রী কিংবা গৃহবধূ কিংবা একটা কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে না। তার একটা স্বাধীন নারীসত্তাও আছে, তা মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেবেই। মহাবলিপুরমে মা ছিলেন তরুণী এবং যথেষ্ট রূপসী, ওই সনৎ নামে লোকটি, তার পদবীও ভুলে গেছে রজত, সে মায়ের প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল, যেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মা যে তাকে বিশেষ প্রশ্রয় দিয়েছেন তা নয়, মাকে ঘিরে সব সময় একটা সম্ভ্রমের অদৃশ্য আভরণ থাকত। শুধু সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণের জন্য মনে ছিল না যে তিনি কারুর জননী বা কারুর স্ত্রী, তিনি শুধু বিনতা নামে একজন নারী, দেবীর মতন তিনি উপভোগ করছিলেন একজন পুরুষের বন্দনা। কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের স্পর্শই তাঁকে সাময়িকভাবে উচ্ছল করে তুলেছিল। অনেক নারীই সমুদ্রকে মনে করে এক প্রবল পুরুষ।

বাবার জ্বর ছাড়েনি, অসুস্থ অবস্থাতেই বাস জার্নি করতে হয়েছিল। পথে যাতে কোনও অসুবিধেয় পড়তে না হয় তাই সনৎ স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে এসেছিলেন পণ্ডিচেরি পর্যন্ত। বাবার কত সেবা করেছেন তিনি, এটা তাঁর মহত্ত্বের পরিচয়, কিন্তু আরও কয়েকটা দিন তিনি যে বিনতা দেবীর সাহচর্য পেতে চেয়েছিলেন, এটাও কি সত্য নয়? মাও কি তা জানতেন না, সনতের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে তিনি কি রাঙা হয়ে উঠতেন না প্রায়ই?

রজত অবশ্য মায়ের এই দুর্বলতার জন্য কোনও ক্ষোভ পুষে রাখেনি। এখন সে নির্লিপ্তভাবে বিচার করে দেখতে পারে যে মায়ের ঐ ক্ষণিক চাঞ্চল্য ছিল খুব স্বাভাবিক। তাতে কোনও মালিন্য ছিল না।

এ জন্য বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কের কোনও চিড় ধরেনি। ছেলেমেয়েদের পক্ষে হয়তো সবটুকু জানা সম্ভব নয়, তবু রজত যতটুকু দেখেছে, বাবা ও মায়ের মধ্যে কোনও টেনশন ছিল না। বাবা ঠাট্টা ইয়ার্কির সুরে কথা বলতেন। ভেতরে ভেতরে একটা মায়ার টান না থাকলে কি মানুষ সারা জীবন হালকাভাবে কথা বলতে পারে?

সেদিন মায়ের কথায় হঠাৎ যেন খানিকটা ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল, যেন বলতে চাইলেন, বাবা তাঁর স্বামী হিসেবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেননি, ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল পার্টটাইম। এটা

www.BanglaBook.org

কি সত্যিই মায়ের মনের কথা ? কিংবা রজতের সঙ্গে বর্ণার মন কষাকষি হয়েছে ধরে নিয়ে মা বোঝাতে চাইলেন, সব স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই এরকম হয়। এইভাবেই জীবন ও সংসার চলে।

বাবা বেঁচে থাকতে মাকে কখনও এমন অভিযোগ করতে শোনেনি রজত। রাজনীতির কাজে বাবা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন, বাড়িতে ফিরে এলেই বেশ একটা উৎসব, হইচইয়ের পরিবেশ হত। মা নিজে সক্রিয় রাজনীতি না করলেও বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন মা, তিনি বলতেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণই ইতিহাসের সার্থক পদক্ষেপ। ধনতন্ত্রের এখনও যতই চাকচিক্য ও দর্প থাক, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কাছে এক দিন তা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেও মা খুব একটা নিরাশ হননি, বলেছিলেন, ইতিহাসের অগ্রগতি কখনও সমানভাবে হয় না, অনেকটা এগিয়ে যায়, আবার একটু পিছিয়ে আসে, পাহাড়ের রেল লাইনের মতন। একদল বর্বরের হাতে এক-একটা সভ্য জাতি হেরে গিয়ে তছনছ হয়ে গেছে বারবার, আবার জেগে উঠেছে।

সারা জীবন রাজনীতি করে গিয়েও বাবা বড় গোছের নেতা হতে পারেননি। তাঁর চরিত্রে ঠিক নেতৃত্ব দেবার মতন দিকটা ছিল না। হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে-মেঁচিয়ে মেঠো বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। মেঠো বক্তৃতায় কিছু কিছু মিথ্যেকে গলার জোরে সত্যি করে তুলতে হয়, গালাগালি দিতে হয় বিরুদ্ধপক্ষকে, যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য থাকে। বাবা বড় বেশি ভদ্র ছিলেন, গালাগালি তাঁর মুখে আসত না। ছোটখাটো সভায় আন্তরিকতার সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা করতেন বাবা। পার্টির লোকের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন না তেমন। তা নিয়ে অবশ্য বাবার মনে কোনও অসন্তোষ ছিল না। পরাধীন আমলের কর্মী ছিলেন, ওঁরা মনে করতেন আত্মত্যাগেই প্রকৃত দেশসেবা, ইচ্ছে করে শরীরকে কষ্ট দিতেন, গ্রামেগঞ্জে ঘোরার সময় যেখানে খাদ্য জোটানো সম্ভব, সেখানেও থাকতেন না খেয়ে। খোলা জায়গায় শুয়ে থাকলেই ওঁর হাঁপানি বেড়ে যেত, তবু তা নিয়ে বেশ গর্ব ছিল বাবার। বামপন্থীরা যখন ক্ষমতায় এলো, রজতের বাবাকে কেউ তখন মন্ত্রিত্ব নেবার জন্য ডাকেনি, তিনিও লালায়িত হননি, এমনকি একটা টেলিফোন কানেকশান পাবার জন্যও বলতে যাননি কারুকে। বড় বড় নেতারা সবাই চিনতেন তাঁকে, বাড়িতে আসতেন পরামর্শ

www.BanglaBook.org

নিতে, অনেক দিন পর্যন্ত সরকারি মহলে রজতের পরিচয় ছিল, সে জগদীশদার ছেলে !

শেষের দিকে বাবাকে খুব আঁকড়ে ধরেছিলেন মা, আর কলকাতার বাইরে যেতে দিতেন না। বাবার শরীরটা বেশ ভেঙে পড়েছিল, ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি, হাঁপানির টানে রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না, উঠে বসে থাকতেন, মাও জাগতেন বাবার সঙ্গে সঙ্গে। মা যখন বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতেন, তখন বাবা বলতেন, বিনু, তোমার হাতখানা যেন দিন দিন আরও নরম, আরও কোমল হয়ে আসছে। এত ভালো তো আগে কখনও লাগেনি !

অত অসুস্থ শরীর নিয়েও রোজ একবার পার্টি অফিসে যাওয়া চাই। এক দিন সেখানেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। ধরাধরি করে বাড়িতে আনার পর জ্ঞান ফিরলো বটে, কিন্তু হাঁটাচলার শক্তি আর ফিরে পেলেন না। বাবার সমসাময়িক অনেকেই তখন কথায় কথায় রাশিয়ায় চিকিৎসা করাতে যায়, বাবার পার্টির সহকর্মীরা সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, বাবা রাজি হলেন না কিছুতেই।

বাবার শেষশয্যার পাশে অবশ্য রজত উপস্থিত ছিল না। সে তখন পুলিশের তাড়া খেয়ে অনবরত জায়গা বদলাচ্ছে। খবর যখন তার কাছে পৌঁছোলো, তার মধ্যে বাবার নশ্বর শরীরটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মার সঙ্গেও দেখা করে যেতে পারেনি রজত, তবে জানতে পেরেছিল যে দিদি এসে আছে মায়ের কাছে।

রজত অনেকবার অনেক জায়গায় আত্মগোপন করে থেকেছে। নাম বদল করতে হয়েছে, আশ্রয় পাল্টেছে, গ্রামের চাষীর গোয়ালঘরে কিংবা ইংল্যান্ডে কোনও বুড়ো-বুড়ির পেয়িং গেস্ট হয়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল সে। সে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত বিবাহিত জীবনই সবচেয়ে নিরাপদ এবং স্থায়ীভাবে আত্মগোপনের উপায়। অনেকেই তো সেভাবে রয়েছে। তবু রজত পারছে না কেন ? বারবার সে আপন মনে বলে, এত শক্ত ! এত শক্ত !

তার যোগ্যতার তো কোনও ঘাটতি ছিল না। তার স্বাস্থ্য ভালো, অসুখের বাতিক নেই। সে অনেকের তুলনায় ভালো উপার্জন করে। বাবার অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পীড়াপীড়িতে রজতকে কমার্স পড়তে হয়েছিল। রজত এম. কম পাস করলেই তাঁর কোম্পানিতে রজতের চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। রজত আর ততদূর পড়েনি, তাঁর কাছে চাকরি চাইতেও যায়নি, জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেই সে লন্ডন চলে গিয়েছিল, সেখানে চার্টার্ড

www.BanglaBook.org

অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করেছে। ফিরে আসার পর নিজের যোগ্যতাতেই বড় কোম্পানিতে চাকরি পেতে তার অসুবিধে হয়নি। অধিকাংশ সংসারী মানুষেরই চাকরিতে উন্নতি করার যেমন ঝোঁক থাকে, রজতেরও আছে।

বর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে পারস্পরিক দেখাশুনোয়, দু'জনেরই আগ্রহে। রজতের অতীতও বর্ণার অজানা নয়। বহরমপুরে যখন রজত অজ্ঞাতবাসে ছিল প্রায় আট মাস, সেই সময় বর্ণার সঙ্গে পরিচয়। হ্যাঁ, শুধু পরিচয়, প্রেম নয়। তখন রজতের কাছে প্রেম ছিল একটা দূষিত শব্দ। 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'। বহরমপুরেই প্রায় ধরা পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। সেখান থেকে বিহারে, দেওঘরের কাছে রিখিয়ায়, একটি বাগানের মালির ছদ্মবেশে কেটেছে কিছুদিন। রিখিয়া থেকে প্রথম বর্ণাকে চিঠি লেখে রজত, 'তুমি আমাদের কাজে হাত মেলাবে ?' আমার নয়, আমাদের। রজতদের ভাষাই হয়ে গিয়েছিল ওই রকম, 'আমি'-র বদলে সব সময় বলত 'আমরা', ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষার স্থান ছিল না। লন্ডন থেকে রজত যেসব চিঠি লেখে, তাতে প্রথম আমি আসে। তার আগে, সিউড়ি যাবার পথে আর একবার দারুণ ঝুঁকি নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিল কেন রজত ? বন্ধুদের বলেছিল, আহত সুকুমারকে তার নিজের হাতে একটা জিনিস পৌঁছে দেবার প্রয়োজন ছিল, কথাটা মিথ্যেও নয়, সেই সঙ্গে বর্ণার সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়ার দুরন্ত ইচ্ছেও কি ছিল না ? বহরমপুরের পথে সিউড়ি না এলে হয়তো সেবার অত সহজে সে ধরা পড়ত না।

তিন বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে, গেটের বাইরে সে দেখেছিল বর্ণাকে। ইংল্যান্ডে যাবার ভিসা লাগত না তখন, বর্ণার বাবার চেষ্টাতেই সে চট করে সাগর পাড়ি দিতে পেরেছিল। না হলে রজতকে আবার পুলিশ গ্রেপ্তার করত, আরও কয়েক অভিযোগ এনে গারদে ভরে দিত। রজতকে মেরে ফেলারই ইচ্ছে ছিল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের, যেমনভাবে ওরা মেরেছে সরোজ দত্তকে, রজতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তমাল আর বিনয়কে, আরও কতজনকে কে জানে ! ভোরবেলা কোনও নির্জন জায়গায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বলত, যা পালা ! দৌড়ো ! তারপর পেছন দিক থেকে কুকুরের মতন গুলি করে মারত। তার নাম ছিল সংঘর্ষ।

বিলেতে গিয়ে রজত বেঁচে যায়। তার কত বন্ধু তো বিলেতে

www.BanglaBook.org

রয়েই গেল, আর ফিরলো না। রজতও থেকে যেতে পারত, ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে চাকরি শুরু করেছিল ম্যানচেস্টারে, কিন্তু রজত ফিরে এসেছে যত না তার মায়ের টানে, তার চেয়েও বেশি বর্ণার টানে। প্রেম ছিল, বর্ণাকে পেলে তার জীবন সার্থক হবে, এই রকম একটা ধারণা নিয়েই সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এটাই তো আদর্শ বিয়ের ভিত্তি।

তবু সে ভিত্তিতে মাঝে মাঝেই ফাটল ধরতে চায় কেন ?

আগেকার সেই বিপজ্জনক জীবনধারা একেবারেই ত্যাগ করেছে রজত। রাজনীতির সঙ্গে আর কোনও সংস্রব রাখেনি। বন্ধুরা অনেকেই নেই, আবার অনেকেও তো আছে। দু-চারজন নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। কন্ট্রাক্টরি-ফন্ট্রাক্টরি করে অবৈধ টাকা রোজগারের নেশায় মত্ত, কেউ কেউ ফিরে গেছে স্বাভাবিক জীবনে, আরও বেশ বড় একটি দল এখনও আদর্শ বা নীতি ছাড়েনি, নীরবে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনে, সমাজসেবায়, ট্রেড ইউনিয়ানে। তাদের সঙ্গে রজতের দেখা হয়, রজতকে তারা প্রায়ই টানবার চেষ্টা করে, দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে রজত। বিবাহিত, সংসারী মানুষের খোলস ছেড়ে সে আর বেরুতে রাজি নয়। পুলিশের খাতায় তার নাম এখন পরিষ্কার, বর্ণা তো এটাই চেয়েছিল।

অতি আদরণীয় দুটি ছেলেমেয়ে জন্মেছে তাদের। কানা-খোঁড়া নয়, বোকা-সোকা নয়, বাপ-মায়েরা ঠিক যেমনটি চায়। ইস্কুলে ভর্তি করতেও তেমন অসুবিধে হয়নি। ওদের নিয়ে কোনও অশান্তি নেই।

দাম্পত্য জীবনে আগুন জ্বালায় কোনও বিশেষ তৃতীয় নারী বা পুরুষ। আজকাল অবশ্য নৈতিক বন্ধন কিছুটা আলগা হয়েছে। তৃতীয় কেন, চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তিও মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে, তারা বিশেষ না হলেই হলো। স্বামীর সঙ্গে যদি পুরনো কোনও কলেজ-বান্ধবীর অনেক দিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে যায় পথে, তাহলে তার সঙ্গে কোনও চায়ের দোকানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। দু জনের থিয়েটারের টিকিট কাটা আছে, এর মধ্যে হঠাৎ যদি স্বামীকে অফিসের কাজে বাইরে চলে যেতে হয়, তাহলে স্ত্রী অন্য কোনও পরিচিত পুরুষের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যেতেই পারে। একজন কোনও বন্ধু মাঝেমাঝেই বাড়িতে আসে, স্বামী না থাকলেও এসে পড়ে, তাতেই টি টি পড়ে যায় না। মিনিবাস ভাড়া করে পিকনিকে যাবার সময় স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি বসে

www.BanglaBook.org

যাবার নিয়ম নেই, স্বামীর পাশে অন্য নারী, স্ত্রীর পাশে অন্য পুরুষ। এ সবই কৌতুকের ব্যাপার।

বর্ণা কী জন্য রজতকে পছন্দ করেছিল তা হয়তো সে নিজেই জানে না। কিছুটা রজতের চেহারা, কিছুটা তার ব্যক্তিত্ব। অন্য অনেকের মধ্যে রজতের দিকে প্রথমেই চোখ পড়ে। রজতের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি বর্ণার কোনও আগ্রহ বা সমর্থন ছিল না। প্রথম প্রথম, রজত যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে বা দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছে, তখন বর্ণার চোখে মনে হত সেগুলো নায়কোচিত গুণ, অল্প বয়েসে 'পথের দাবি'র সব্যসাচীকে যেমন ভালো লাগে। এখন বর্ণা রাজনীতির সংস্রবও পছন্দ করে না, ছেলেমেয়ের মা হিসেবে এখন সে মনে করে, নকশালপন্থীরা বহু ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। রজত তর্ক করে না, এড়িয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পর রজত তার স্ত্রীর মনে ক্ষোভের কোনও কারণ ঘটায়নি।

বর্ণা লঘু আমোদ পছন্দ করে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের ছুটি হলেই বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া, ভালো হোটেলে থাকা, গুচ্ছের অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটি। পরিচিত একটা ছোট গোষ্ঠীকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো, পাল্টা নেমন্তন্নতে অন্যের বাড়িতে বিলিতি বাজনার সঙ্গে নাচ। রজতের পক্ষে এরকম নাচ অকল্পনীয়, তবে তার স্ত্রী কোনও পরপুরুষের সঙ্গে নাচতে গেলে সে আপত্তি জানাবে কেন ? নাচের সময় পরস্পরের কোমরে হাত, গালে গাল ঠেকে যায়, বুকে বুক, এ সবই পশ্চিমী পচা-গলা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, অপসংস্কৃতি, রজত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। অনির্বাণ নামে বর্ণার দিদির দেওর প্রায়ই বর্ণার সঙ্গে খুনসুটি করে, বর্ণাকে নিয়ে নাচতে চায়, কিন্তু অনির্বাণকে ঈর্ষা করার যোগ্যই মনে করে না রজত।

বিয়ের পর প্রেম ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। সারা জীবন যারা প্রেম প্রেম ভাব করে, তাদের ব্যাপারটাই বরং ন্যাকা ন্যাকা মনে হয়। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ নাকি বড় জোর দু বছর থাকে। শরীর যখন খুব চেনা হয়ে যায়, তখন মনটাকে সংসারে ধরে রাখতে গেলে শুধু প্রেম দিয়ে আর হয় না, তখন দরকার স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতার মতন কিছু অতিরিক্ত বন্ধন। বিয়ে ব্যাপারটা প্রকৃতির বিধান নয়, একটা সামাজিক মোড়ক, এটা মনে রাখলে সুবিধে হয়। রজত আপ্রাণ চেষ্টা করে এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোড়কটাকে রক্ষা করতে।

বিবাহিত জীবনের এতগুলি বছরে রজত দ্বিতীয় কোনও নারীকে তার জীবনে বিশেষ স্থান দেয়নি। বর্ণাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, সে ভালোবাসা আগের মতন অত তীব্র না থাকলেও মিলিয়ে যায়নি একেবারে, বর্ণাকে সে অনেকটা স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। রজত জানে যে স্ত্রীকে ভালোবেসেও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া যায়, সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু তাদের বিবাহিত জীবনে যাতে কোনওক্রমে চিড় না ধরে, সে জন্য রজত বদ্ধপরিকর। এই বিয়ের মধ্যে সে আত্মগোপন করে আছে, এইভাবে থাকাটা তার পক্ষে খুব জরুরি। বিয়ে না করলে সে যে আরও কত লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটাত তার ঠিক নেই। তার ভেতরের পশুটাকে শুধু সে চেনে, আর কারুকে দেখাতে চায় না। এই জন্যই সে অফিসের কাজে মাথা গুঁজে থাকে, বাড়িতে এসেও সাবধানে থাকে, বর্ণার সঙ্গে কখনও সামান্য কথা কাটাকাটি বা মতভেদ হলেও সে রাগ করতে করতে হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। তবু এক-এক সময়ে তার অসহ্য বোধ হয়, বর্ণার সঙ্গে ঝগড়া না হলেও, এই সংসারী জীবনটা তার কাছে মনে হয় এক বিরাট বোঝা, সে আর বইতে পারছে না। সব কিছু ভেঙে চুরে এক লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। তখন সে বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালে আর ফিসফিস করে বলে, তোমাকে পারতেই হবে, রজত, শান্ত হও, শান্ত হও, একবার ভেঙে বেরুলে তুমি একেবারেই হারিয়ে যাবে। শান্ত হও, শান্ত হও, নিজের মধ্যে ফিরে এসো।

রজত নিজে অন্য নারীদের দিকে কখনও এগোবার চেষ্টা না করলেও দু-একটি মেয়ে নিজে থেকেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে। রজত আকর্ষণীয় পুরুষ। সে কম কথা বলে, সেটাও তার একটা আকর্ষণ। রীতা আর শঙ্করী, এই দুটি মেয়ে বিভিন্ন সময়ে তার কাছ ঘেঁষে বসতে চেয়েছে, তাই নিয়ে কয়েকজন হাসাহাসিও শুরু করেছিল, কিন্তু বর্ণা তার অনুভূতি দিয়ে বুঝেছিল যে তার স্বামী মাছের মতন পিছলে পিছলে সরে যায়। বর্ণা এক সময় রজতকে বলত, তুমি কোনও পার্টিতে গোমড়া মুখে বসে থাকো কেন ? অন্য সব মেয়েদের ভয় পাও নাকি ? জানো না, যে-স্বামীরা সব সময় বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বউরাও তাদের পছন্দ করে না। তারপর থেকে রজত অন্যদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, জোক-বুক কিংবা রিডার্স ডাইজেস্টে পড়া রসিকতা ঠিকঠিক জায়গায় লাগাবার চেষ্টা করে।

www.BanglaBook.org

সংসারটা একটা তারের খেলা। পা টিপে টিপে অতি কষ্টে ভারসাম্য বজায় রেখে এগোচ্ছিল রজত, শুধু একবার সে একটু পা ফস্‌কেছে, তাও বিরাট কোনও পতন বলা যায় না, কয়েক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা, তা কি একেবারে ক্ষমার অযোগ্য ! বর্ণার কাছে সে কাতর মিনতি করে বলেছে, আমার ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় করে ফেলেছি, আমায় তুমি ক্ষমা করো বর্ণা, শুধু এই একবারই।

কিন্তু ক্ষমা করতে গেলে অন্যায়টা সঠিক কী ছিল এবং কেন সেটা করতে গিয়েছিল রজত, তাও তো পুরোপুরি জানা দরকার। এগুলিই যে স্পষ্ট নয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল মাস দু-এক আগে। তারপর থেকে বর্ণা আর রজতের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি। বাপের বাড়ি চলে যাবার আগের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক রাতেই বর্ণা ছেলেমেয়েদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। এটা রজতের প্রতি কঠিন শাস্তি। এর আগে দু'জনে কখনও বিচ্ছিন্ন থাকেনি, রজতের শরীরের জ্বালা বেশি, যে-সব রাতে বর্ণা মিলিত হতে চায় না, সে-সব রাতেও বর্ণাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে না থাকলে তার শরীর জুড়োয় না। দু মাস ধরে বর্ণা আলাদা থাকতে শুরু করেছিল, রজত ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। সে অভিমানী শিশুর মতন বালিশে মুখ ঘষে ঘষে কেঁদেছে। কেউ জানে না, রজত প্রায়ই একা একা কাঁদে।

এই দু' মাসের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ মাঝরাত্রে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে বর্ণা। মাথার চুল খোলা, চোখে যেন আগুনের ফুলকি। রজতের বিছানার কাছে এসে চাপা গলায় বলেছে, সত্যি করে বলো তো, তুমি কেন ও কাজ করেছিলে ? কেন ওখানে গিয়েছিলে ? মেয়েটাকে কতদিন ধরে চিনতে ?

রজত কাতর গলায় বলেছে, মেয়েটিকে সত্যি আমি চিনতাম না, কোনওদিন একটাও কথা হয়নি। বিশ্বাস করো, তুমি যে-কোনও শপথ নিতে বলো—

—তা হলে কেন ওখানে গিয়েছিলে ?

—আমি জানি না। আমার মনে নেই। আমি ক্ষমা চাইছি। বর্ণা, আর কোনওদিন এমন হবে না।

—তোমাকে বলতেই হবে, কেন ওখানে গিয়েছিলে ! বলতেই হবে !

—আমার মাথার ঠিক ছিল না। নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিলাম !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। যে-মানুষ এখন পাগল নয়, যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল, সেদিনও সে সুস্থ অবস্থায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের কাজ করেছে, সে শুধু দু' তিন ঘণ্টার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল, এ কথা শুনলে কেউ মানবে ?

রজত বর্ণার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ওটা কি মন থেকে মুছে ফেলা যায় না ? আমি তোমার সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

বর্ণা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে যেতে বলেছিল, সবার কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে ! সবাইকে কি আমি বলবো আমার স্বামী পাগল ?

সারা রাত আর ঘুমোতে পারেনি রজত, ছটফট করেছে নিঃসঙ্গ বিছানায়। এর থেকেও অনেক বড় অপরাধে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু যে-অন্যায়ের প্রকৃত চেহারাটাই বোঝা যায় না, তার আয়তনও যে অস্পষ্ট।

ইনকাম ট্যাক্স উকিলের বাড়ি সল্ট লেকে। অফিস থেকে বেরিয়ে রজতকে প্রায়ই সেখানে যেতে হয়, তাই সে দেরি করে বাড়ি ফেরে। কিন্তু সেদিন বেহালা শখের বাজার, জোকা ছাড়িয়ে একটা জায়গায় রাত সাড়ে আটটার সময় গিয়েছিল কেন রজত ? 'আম্রপালি' নামে একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল সে। ঠিক হোটেল নয়, ওগুলোকে বলে রিসর্ট, ডায়মন্ডহারবার রোডের ও দিকটায় এরকম রিসর্ট অনেকগুলি গজিয়ে উঠেছে। দল বেঁধে ওখানে পিকনিক করতে যাওয়া যায়, শুধু দিনের বেলা নয়, চাঁদের আলোতেও, রাত্রে থাকার ব্যবস্থা আছে। শুধু একটি দম্পতিও ওসব জায়গায় একরাত বা দু-তিন রাতের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে হাওয়া বদল করে আসতে পারে। তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী কি না তাও কেউ জিজ্ঞেস করবে না। শহরের সহস্র দৃষ্টি থেকে একটা পালাবার জায়গা।

না, রজত সেখানে ঘর ভাড়া করেনি, কোনও মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যায়নি। কিন্তু সে যে কাজটি করেছিল তা অতীব দুর্বোধ্য।

সেই 'আম্রপালি'র সামনে অন্য একটি গাড়ি থেকে নেমেছিল এক জোড়া নারীপুরুষ। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ও একটি তরুণী। তারা হাত ধরেছিল এবং হাসছিল হালকা মেজাজে। আচমকা রজত একটা গণ্ডারের মতন ছুটে গিয়েছিল তাদের মাঝখানে, লোকটির নাকে কষিয়েছিল একটা প্রচণ্ড ঘুষি। লোকটি ছিটকে পড়েছিল মাটিতে, আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মেয়েটি।

রজতের হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না, কিন্তু তার চোখ ঝলসে

www.BanglaBook.org

উঠেছিল হিংস্র আততায়ীর মতন। ঝুঁকে পড়ে লোকটিকে তুলে আবার মারতে গিয়েছিল সে।

মেয়েটির চিৎকারে ছুটে আসে আট-দশজন লোক। ওসব রিসর্টের নিজস্ব কিছু মাস্‌লম্যানও থাকে। অতি দ্রুত বিচার হয়ে যায় জনতার আদালতে। রজত কে ? ওখানে কেউ চেনে না। মেয়েটিও চেনে না, সে হলফ করে বলেছিল, জীবনে সে রজতকে দেখেনি। তার কোনও আত্মীয় বা ব্যর্থ প্রেমিক বা পাড়ার ছেলেও নয়। লোকটিও রজতকে চেনে না, তার কোনও জ্ঞাত শত্রুও নয়। তা হলে রজত নিশ্চয়ই কোনও ভদ্রবেশধারী গুণ্ডা। হয় সে লোকটির পকেট থেকে টাকা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, অথবা লুট করে নিতে চাইছিল মেয়েটিকে।

লোকেরা মারতে মারতে সেখানেই রজতকে শেষ করে দিত। অতি নিরীহ সব গ্রামের লোক আজকাল কারুকে ডাকাত বা ছেলেধরা সন্দেহে ইট ছুঁড়ে বা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তারাও পুলিশকে গ্রাহ্য করে না, পুলিশও এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

যে-লোকটি রজতের ঘুষি খেয়েছিল, তার দয়াতেই বেঁচে যায় রজত। সেই লোকটিই বাধা দিয়ে বলে, না, না, একেবারে মেরে ফেলো না, থানায় জমা দাও !

আহত, রক্তাক্ত, অচেতন রজতকে যখন কাছাকাছি ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হলো, তখন সেখানে অন্য একটি কেসের তদ্বির করার জন্য বসে আছেন স্থানীয় এম এল এ। জনসংযোগ করা এম এল এ-দের প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উত্তেজিত জনতাকে দেখে তিনি সামনে এসে হাত তুলে ভরাট গলায় বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি !

তারপর রজতকে দেখে তিনি সত্যিকারের বিস্ময়ের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে বলেন, এ কী, রজত !

নিয়তির কী পরিহাস ! ছাত্র বয়সে এক সঙ্গে দুজনে রাজনীতিতে নেমেছিল, তাদের মধ্যে একজন এখন সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, আর একজন জনতার প্রহারে জর্জরিত, তার নামে কুৎসিত অভিযোগ, রক্ত ও ধুলো-কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে চোখ বুজে।

বালতি বালতি জল ঢেলে রজতের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। এম এল এ দ্বিজেন বাগচি এরই মধ্যে দিশেহারা হয়ে টেলিফোন করেছেন কলকাতায় আর এক এম এল এ সত্যব্রত মজুমদারকে। দুই এম এল এ দুই বিরোধীপক্ষের, তবু বেশ ভাব

www.BanglaBook.org

আছে। অ্যাসেম্বলিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে জুতো ছোঁড়ে, রাত্তিরে বিশিষ্ট কোনও শিল্পপতির বাড়িতে খানা খেতে যায়। সত্যব্রত মজুমদার বর্ণার জ্যাঠতুতো দাদা, কংগ্রেসের শক্ত খুঁটি, রজতকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

জ্ঞান ফেরার পর রজত কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারেনি। ভাঙা ভাঙা গলায় বার বার বলেছিল, কী জানি কী হয়েছিল, মনে নেই, আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি!

দুই এম এল এ-র তৎপরতায় কেস আর কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়নি, সেই রাত্রেই সব ধামাধাপা পড়েছিল। সত্যব্রত মজুমদার নিজের গাড়িতে রজতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং নিজের বোনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বর্ণাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি।

নিতান্ত মূর্খ আর গোঁয়ার না হলে কেউ ওরকমভাবে একটি লোককে হঠাৎ ঘুষি মারতে যায়? সে জন্য আফসোসে রজতের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। নিজেকে সে যে-কোনও কঠিন শাস্তি দিতে চায়। ভেতরের জন্তুটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিল এক লাফ দিয়ে। কিন্তু রাত সাড়ে আটটার সময় সে ওই জায়গায় কেন গিয়েছিল, তা আর কেউ জানবে না। এমনও কিছু কথা থাকে, যা কারুকেই জানানো যায় না, নিজের স্ত্রীকেও না, মাকেও না।

॥ ৩ ॥

দোতলার ওপর ছাদ। সিঁড়ির মাথায় একটা ছোট লম্বাটে ঘর রয়েছে, চওড়ার দিকটা এতই কম যে সেখানে একটা খাটও পাতা যায় না। এককালে এটা ছিল মায়ের গোঁসাঘর। এ পরিবারে ঠাকুরঘরের পাট নেই। এখন এখানে নানা অব্যবহৃত জিনিসপত্র ঠাসা থাকে। গাদা করা পুরনো বই, তিন চাকার সাইকেল, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, পায়া ভাঙা কাশ্মীরি টি-পয়, খালি বিস্কুটের টিন। এর কোনটিই আর ব্যবহার করা যাবে না কোনদিন, তবু মায়াবশত ফেলে দেওয়া হয় না। সব কিছুর সঙ্গেই স্মৃতি জড়ানো। তবে কে আর এখন পুরনো স্মৃতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যায়!

রজত ছাদের ঘরে এসেছে একটা বই খুঁজতে। নিখিলের কাছ থেকে সে পাবলো নেরুদার আত্মজীবনী পড়তে নিয়েছিল, নিখিল বারবার ফেরত দেবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। বইখানা দোতলার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের কাছেও নেই, বর্ণা হয়তো ভুল করে

www.BanglaBook.org

পুরনো কাগজপত্রের সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বর্ণা চলে গেছে, ছ' দিন হয়ে গেল। কোনও যোগাযোগ নেই, কোনও সাড়াশব্দ নেই। ছেলে আর মেয়ের কলকোলাহল বঞ্চিত এই বাড়িটা একেবারে নিঃশব্দ থাকে। রজত এখনও নিজেকে ফেটে পড়তে দেয়নি, শান্ত আছে। নিয়মিত অফিস যায়, সন্ধের পর বাড়ি ফেরে, কোনে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে না, মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন কিছু সময় কাটায়।

একটা বই খুঁজতে গেলে অন্য অনেক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে করে। রজতের স্কুল-কলেজের অনেক বই-খাতা মা এখানে জমিয়ে রেখেছেন। লিউ সাউ চি'র 'কী করে সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে হয়', মাও সে তুং-এর 'তিনটি লেখা', 'দেশব্রতী', 'অনীক', 'ছাত্র ফৌজ', 'নিন্দুক' এই সব পত্রিকার কিছু কপি। রজত যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখনো মা এগুলো নষ্ট করে ফেলেননি। এখন এদের চেহারা কত নিরীহ হয়ে গেছে।

হঠাৎ যেন রজত দু'বার ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেল। মা ? না, ঘরে আর কেউ নেই।

বাইরে যতই শান্ত ভাব বজায় রাখুক, রজতের স্নায়ু অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে আছে। এই কয়েক দিন মাঝে মাঝেই সে এরকম কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

স্বামীর ওপর অভিমান করে এই ঘরে এসে কাঁদতেন মা। ছেলের কাছ থেকে আঘাত পেলে মা কী করতেন ? রজত তো বেশ কয়েকবার আঘাত দিয়েছে।

রজতের কাছে মা সরাসরি কখনও অভিযোগ জানাননি। কিন্তু বর্ণা কিছু কিছু শুনেছে। মা নাকি বলেছেন, আণ্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময় সাড়ে তিন মাস যখন রজতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি, যখন চতুর্দিকে নকশাল ছেলেদের গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে, রজতও সম্ভবত বেঁচে নেই এরকম গুজব ছড়িয়েছিল, সেই সময় দুঃস্বপ্নে-দুশ্চিন্তায় মায়ের ডায়াবিটিস রোগ ধরে। প্রথমেই এক লাফে আড়াই শো হয়ে গিয়েছিল। আর বাবা যে পার্টি অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, তাও কি রজতের জন্য ? বাবা মুখে কিছু বলতেন না, রজতের প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকতেন। মাকে শুধু একবার বলেছিলেন, আমার ছেলের কোনও ব্যাপারে আমি বাধা দিতে পারবো না। আমিও তো আমার বাবার দারুণ অমতে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলাম। তখন সেটাও কম বিপজ্জনক ছিল না।

www.BanglaBook.org

ফরসা হাত-কাটা গেঞ্জি আর পাজামা পরা, রজত হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে। রজতের আকাশে কোনও ঈশ্বর নেই। আর কোনও পুলিশ অফিসারের সামনে তাকে জবানবন্দী দিতে হবে না। এই নিরালায়, রবিবারের দুপুরে ছাদের ঘরে রজত নিজের কাছে স্বীকারোক্তি করছে।

তার সামনে দেয়াল, দেয়ালের এক কোণে বেশ বড় একটা মাকড়সার জাল, তাতে রামধনু রঙ। মাঝখানে বসে আছে মাকড়সাটি বেশ একটা গেরেমভারি ভঙ্গিতে। ধরা যাক এই মাকড়সাটাই একজন বিচারক।

ছেলেবেলায় বাবা ছিল আমার হিরো। অনেক ছেলের কাছেই বোধ হয় তাই থাকে। কিন্তু আমি ভাবতাম, আমার বাবার মতন মানুষ আর হয় না, আমিও বড় হয়ে বাবার মতন হব। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই আমি সেই বাবাকে আড়ালে উপহাস করতে শুরু করি।

বাবার কাছ থেকে, শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও আমাকে দূরে সরিয়ে নেয় অনিমেষ। ওকে আমি পাগলের মতন ভালোবাসতাম। কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে কাছাকাছি বয়েসের মেয়েদের সঙ্গে আমি মিশতে পারতাম না, মুখচোরা স্বভাব ছিল। এ জীবনে প্রথম আমি সত্যিকারের ভালোবাসতে শুরু করি অনিমেষকে। দুটি সমবয়েসী ছেলের এই তীব্র ভালোবাসার ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা যাই-ই হোক না, এ কথা ঠিক, অনিমেষের সঙ্গে এক দিন দেখা না হলেই আমার খুব কষ্ট হত।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ক্লাস টেনে আমাদের সেকশনে এসে ভর্তি হলো অনিমেষ। ওদের বাড়ি বহরমপুর, সেখান থেকে ওকে সরিয়ে আনা হয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। পড়াশুনোয় দুর্দান্ত ভাল ছিল বলেই অনিমেষ বেশ সহজে ট্রান্সফারের সুযোগ পেয়েছিল।

ক্লাসে এত ছেলে, তবু আমার সঙ্গেই অনিমেষের কয়েক দিনের মধ্যে অত বন্ধুত্ব হয়ে গেল কেন তা কে জানে! এটা একটা রহস্য বলা যেতে পারে। অনিমেষের সঙ্গে অমন বন্ধুত্ব না হলে আমার জীবন হয়তো অন্যরকম হত। আমি মাকে কষ্ট দিতাম না, বর্ণাকে বিয়ে করতাম না, সুবু আর জাম্পির বাবা হতাম না। হয়তো হতাম অন্য পথের পথিক। তবু অনিমেষের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আমি আজও একটুও অনুতপ্ত নই। অমন বন্ধু আর হয় না।

অনিমেষের সঙ্গে আমার চরিত্রের কিছু আপাত অমিল ছিল।

www.BanglaBook.org

আমার ছিল খেলাধুলোর দিকে ঝোঁক, অনিমেষ কোনও রকম খেলার ধার ধারত না। রোগাটে চেহারা, গাল ভাঙা, চোখে আড়াই পাওয়ারের চশমা, মাথার চুল উসকো-খুসকো, বই-সর্বস্ব ছেলে ছিল অনিমেষ। ওই বয়সেই কত রকম বই সে পড়েছিল, গল্প-উপন্যাস-কবিতা, আবার ইতিহাস-রাজনীতি- সমাজতত্ত্ব। ওর কাছেই আমি প্রথম জীবনানন্দ দাশের নাম শুনি, মাও সে তুং-এর লেখা কবিতা অনিমেষই আমাকে প্রথম পড়তে দেয়। মাও সে তুং-এর নামের উচ্চারণ এখন হয়ে গেছে মাও জে ডং, এটা আমাদের কাছে কেমন যেন অচেনা লাগে, ঠিক মেনে নিতে পারি না। সে সময় 'মাও সে তুং' এই নাম ছিল আমাদের কাছে একটা মন্ত্রের মতন। এখনও মনে মনে সেইভাবেই উচ্চারণ করি।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এখনকার পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেরা কত কম পড়ে, মানে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বই পড়ে শুধু রগরগে উপন্যাস। থ্রিলার আর কমিক্‌সে তো বাজার ছেয়ে গেছে। রাজনীতি নিয়ে তারা মাথাই ঘামায় না। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নিজের দেশের কথা চিন্তা করে না। তারা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে নিজেদের কেরিয়ার তৈরি করার জন্য ব্যস্ত। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সাহিত্য-ইতিহাস-অর্থনীতি এসব পড়তে যায় অপেক্ষাকৃত নিরেস ছেলেমেয়েরা, যেন ওসব পড়ার জন্য মেধার দরকার নেই। ছাত্র-রাজনীতি প্রায় স্তব্ধ পশ্চিমবাংলায়। বামপন্থী ছাত্ররাও যে কিসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে ভেবে পাচ্ছে না। পুলিশের সঙ্গে মারামারি না করলে কি ছাত্র রাজনীতি জমে ?

তখন, সেই ষাটের দশকে হঠাৎ যেন একটা জোয়ার এসেছিল। স্কুলের ছেলেরাও অনেকেই অকালপক্ক, সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। কলেজের ছাত্রদের তো কথাই নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজের অবস্থাপন্ন ঘরের ভাল রেজাল্ট করা ছাত্ররাও নিজেদের কেরিয়ারের কথা ভাবেনি, দেশের কথা ভেবেছে, সমাজব্যবস্থা বদলাবার কথা ভেবেছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বহু দেশেই, এমনকি ফ্রান্সের মতন দেশেও ছাত্ররা কয়েক দিনের জন্য সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল না ?

আমাদের বাড়িতে রাজনীতির চর্চা ছিল, আমিও অল্প বয়েস থেকে রাজনীতি-সচেতন ছিলাম। 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটা বাবা আমাকে পড়িয়েছিলেন। আমার কৈশোরের শেষ দিকে বাবাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্য খুব মন-মরা হয়ে থাকতে দেখেছি। কমিউনিস্ট পার্টি দু ভাগ হয়ে যাবার পর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বাবা। যারা ছিল এক কালের ঘনিষ্ঠ কমরেড, এখন তাদের মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অনেক সময় এই দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি এমন অগ্নিবর্ষণ করত, যেন মনে হত, কংগ্রেসের চেয়ে অন্য ভাগটাই বড় শত্রু।

লোকে বলত, কমিউনিস্ট পার্টি দু ভাগ হয়ে এক দিকে গেছে মাথা, আর এক দিকে ধড়। বাবাদের দলটা শুধু মাথা, হাত-পা কিছু নেই, অর্থাৎ একগুচ্ছ বুদ্ধিজীবী, যাদের মুখে শুধু তত্ত্বকথা, কর্মী নেই, কর্মের উদ্যোগও নেই।

আদর্শগত কারণেই পার্টি ভাগ হয়েছিল। জনগণতন্ত্র না জাতীয় গণতন্ত্র? সাদা বাংলায় শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব, না ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নামে ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে আপোস? আমরা ছাত্ররা ও তরুণরা অবশ্যই বিপ্লবের পক্ষে। বিপ্লব একটা রোমাঞ্চকর শব্দ, কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবের ডাকে আমাদের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছিল।

অনিমেষ আর আমি স্কুল ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতাম বাড়িতে, কোনও দিন আমার বাড়ি, কোনও দিন ওর। আমাদের গল্প আর ফুরোত না। অনিমেষের মা ছিল না, তা জেনে আমার মা স্বাভাবিকভাবেই ওকে খুব স্নেহ করতেন। অনিমেষের বাবা থাকতেন বহরমপুরে, কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে অনিমেষ পড়তে এসেছিল। অনিমেষের সেই মামা কিসের যেন ব্যবসা করতেন, নিজেই কোনও দিন রাত এগারোটার আগে বাড়ি আসতেন না, সুতরাং অনিমেষ দেরি করে গেলেও মাথা ঘামাত না কেউ। আমাদের এখানে প্রায়ই অনিমেষ খেয়েদেয়ে ফিরত। আমরা এক সঙ্গে পড়াশুনো করতাম, পাঠ্য বই তো বটেই, কখনও রাজনীতির বই, কখনও কবিতা। অনিমেষের কণ্ঠস্বর ছিল খুব সুরেলা, চমৎকার আবৃত্তি করত।

পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে অনিমেষ ফিরে গেল বহরমপুর। আমি তখন জেদ ধরলাম, আমিও বহরমপুরে যাব, অনিমেষদের বাড়িতে থাকব। মা-বাবা আপত্তি করলেন না। দিদি তখন একটি পঞ্জাবি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বসেছে। মা আর বাবা দু'জনেই প্রগতিশীল, সুতরাং প্রকাশ্যে আপত্তি জানাতে পারেন না, কিন্তু আসলে তো মধ্যবিত্ত মানসিকতা, মনে মনে মেনে নিতে পারছেন না কিছুতেই। পরমজিৎ প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি, গটগট করে উঠে যেত

www.BanglaBook.org

দোতলায় দিদির ঘরে।

অনিমেষ চলে যাবার দুদিন পরে বাবা আমাকে একটা টিকিট কেটে তুলে দিলেন শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে। সেই প্রথম আমার একা ভ্রমণ। দমদম জংশনে একটা সিগারেট কিনে জানলার ধারে বসে টানতে টানতে ভাবলাম আমি বড় হয়ে গেছি। ফুল প্যান্ট আর ফুল শার্ট গুঁজে পরা, পায়ে নটি বয় শু, ঠাকুর্দার আমলের একটা গোল ঘড়ি আমার হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন মা, জীবনে প্রথম সেই একটা সিগারেট দু পয়সা দিয়ে কিনেছিলাম আমার বড়ত্বটা জাহির করার জন্য। আমার বয়স তখন ষোলো বছর পাঁচ মাস, অবশ্য বয়সের তুলনায় আমার চেহারাটা বড়ই ছিল, একুশ-বাইশ বললেও অবিশ্বাস্য মনে হত না। সেই ট্রেন যাত্রাতেই আমি কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম।

বহরমপুরে এসে দেখি সেখানকার ছেলেরা রাজনৈতিক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। একটা বিরাট কোনও পরিবর্তন যেন আসন্ন। কলকাতায় থাকতে এতটা টের পাওয়া যায়নি। এখানে এসে বুঝলাম, কেন অনিমেষকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্লাস নাইন থেকেই সে রাজনৈতিক পোস্টার লেখে ও দেওয়ালে সাঁটে, পার্টি মিটিং-এ যায়। ওর বাবা একজন সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারি, ছেলেকে তিনি সামলাতে পারেন না। প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম, অনিমেষের বাবার চেয়ে অনিমেষের ব্যক্তিত্ব অনেক প্রবল, বাবা বকুনি দিলে সে হেসে ফেলত। ভারি মধুর ছিল অনিমেষের হাসি। অবশ্য, পরে লক্ষ করেছি, মাতৃহীন এই সন্তানটির প্রতি ওর বাবার এমনই স্নেহ ছিল যে কোনও দিন কড়াভাবে ধমক দিতে পারেননি।

মা বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন মুর্শিদাবাদে গিয়ে অবশ্যই নবাব প্যালেস আর খোসবাগে সিরাজের সমাধি দেখে আসি, আমাকে হাত-খরচ দিয়েছিলেন তিরিশ টাকা। কিন্তু সেসব জায়গায় যাওয়াই হল না, সর্বক্ষণ বিপ্লবের আলোচনা। গোরাবাজারে, খাগড়ায় এক একটা দলের সঙ্গে অবিরাম আড্ডা। আলাপ হল পুলকেশ, অলকেন্দু, বাসুদেব, অশোকদা, শ্যামলদা এই রকম আরও অনেকের সঙ্গে। আরেক জন প্রবীণ মানুষকে দেখেছিলাম, অনন্ত ভট্টাচার্য, তিনি আন্দামানে নির্বাসিত ছিলেন অনেক দিন, ফিরে এসে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এসেছিল। বান্ধব প্রেসের সামনে সি পি এম অফিসেও এক দিন গিয়েছিলাম অনিমেষের সঙ্গে, সেই যাওয়াটাই যেন বিপ্লবের পথে এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদক্ষেপ। ওখানে যে যায়, তার ওপরেই পুলিশ নজর রাখে।

বিপ্লবের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চলত সি পি আই পার্টি সম্পর্কে ঠাট্টাতামাশা। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির মতন স্টুডেন্ট ফেডারেশনও দু ভাগ হয়ে গেছে, কলেজ ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে দুই পক্ষে। অনিমেষের বন্ধুরা সি পি আই-কে বলত কংগ্রেসের বি-টিম। ডাঙ্গে চক্র হচ্ছে শোধনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের লেজুড়। চিন ওদের কাছে জুজু।

সি পি আই-এর যে সব নেতাদের নামে ওরা রঙ্গ করে ছড়া বানাত, তার মধ্যে এক-এক বার আমার বাবার নামটাও উচ্চারিত হত। 'জগদীশ আচার্য, কখন কার পা চাটবেন, সেটাই বিচার্য'। পিতৃসম্মান রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাবার ভাষা ছিল না আমার। বাবার পার্টিকে সমর্থন করা মানেই তো বিপ্লবের বিরুদ্ধে যাওয়া! তবু ও কথা শুনলে আমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে যেত, বুকটা টিপ-টিপ করত, মনে হত, আমি দারুণ একটা অন্যায় করছি, চোখের সামনে ভেসে উঠত মায়ের মুখ। মনে মনে বলতাম, ওঁদের নীতি ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বাবা কখনও কারুর পা চাটতে যাননি। কোনও দিন কারুর কাছ থেকে কিছু সুবিধে নেননি!

কোথায় হারিয়ে গেলেন বাবা! নিজের জীবনটা রাজনীতির জন্য ব্যয় করলেন, সংসারে মন দেননি, সব বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাঁধে, চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা করেননি, পার্টির সংগঠন দিকটার জন্য খেটে গেছেন আপ্রাণ, তাঁর নিষ্ঠা ছিল এক শো ভাগ খাঁটি। কিন্তু এখন কে আর তাঁকে মনে রেখেছে। তাঁর মৃত্যুর পর দু-তিন বছর পার্টি অফিসে তাঁর স্মৃতিসভা হত, এখন আর হয় না। কেউ মায়ের সঙ্গে দেখাও করে না। পার্টি অফিসে কোথাও হয়তো তাঁর একটি ফটো ঝুলছে, কিন্তু পরবর্তী কালের নেতারা তাঁর নামটাও মনে করতে পারে কি না সন্দেহ।

অনিমেষ ছাড়া বহরমপুরের অন্য ছেলেরা জানত না যে আমি জগদীশ আচার্যর ছেলে। বাবাকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে চিনতও না। অনিমেষ নিশ্চয়ই বারণ করে দিয়েছিল, পরে আমার সামনে আর ওরা বাবার নাম উচ্চারণ করত না। তবে এই জেনে যাওয়ার ব্যাপারটার ফল ভোগ করতে হয়েছে আমাকে অনেকবার। যখন আমি পুরোপুরি অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন কেউ কেউ আমাকে উত্তেজিত করার জন্য চাপা বিদ্রূপের সুরে বলত, তুই তো জগদীশ আচার্যির ছেলে, তুই কি এ কাজ পারবি? হাত কাঁপবে না তো?

www.BanglaBook.org

শিগগিরই বিরাট একটা কিছু ওলটপালট ঘটতে যাচ্ছে, এরকম একটা উপলব্ধি আমাদের সর্বক্ষণ চঞ্চল করে রাখত। ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্যই নিশ্চয়ই মনে হত এরকম। ভিয়েতনামের ছোটখাটো রোগা-পাতলা মানুষগুলো দৈত্যের মতন আমেরিকান সৈন্যগুলোকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। এ যুদ্ধে আমেরিকার জয়ের সম্ভাবনা নেই।

এই ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত দিয়েই অনিমেষ আমাকে বোঝাত যে ধনতন্ত্রের এখন পচাগলা অবস্থা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পঙ্গু হয়ে আসছে, এই সময়ে একটা প্রবল ধাক্কা দেওয়া দরকার। চিনের নেতৃত্বে সারা এশিয়া জুড়ে একটা বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে, ভারতের পক্ষে এখন আর চুপচাপ থাকা সম্ভব নয়। ভারতের জনগণও ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত।

বাষট্টি সালের চিন-ভারত যুদ্ধ আর পঁয়ষট্টি সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর দেশের অর্থনীতি একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা পৌঁছে গেছে সহ্যের অতীত স্তরে। কেরোসিন তেল উধাও, চালের দাম সাঁইত্রিশ পয়সা থেকে আট আনার মধ্যে ছিল, বাড়তে বাড়তে হল দেড় টাকা কিলো। আমি এর আগে চাল-ডাল-কেরোসিনের কত দাম তা জানতামই না, গ্রামের মানুষ কীভাবে থাকে সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা ছিল না। অনিমেষ ওই বয়সেই কী করে জানত এত সব! বসিরহাটে কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে মরল নুরুল ইসলাম নামে একটা ছেলে। খাদ্যের দাবিতে কৃষ্ণনগরে গুলি চলল, শহিদ হল তিন জন। সারা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, তার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন উপদেশ দিলেন, চালের বদলে সবাই কাঁচকলা খায় না কেন? জ্যোতি বসুর মতন নেতারা সবাই কারারুদ্ধ, আধা সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে কৃষ্ণনগরে, কলকাতাতেও মিছিল হচ্ছে প্রত্যেক দিন। যেন একটা গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কাতেই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে দেওয়া হল।

লড়াইটা হয়েছিল ত্রিমুখী, এক দিকে কংগ্রেস, কংগ্রেস-ভাঙা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালো সি পি আই আর সাতটি বাম দলের জোট সংযুক্ত বামফ্রন্ট। আমরা ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য, আমাদের ভোটের কাজে নামার জন্য নির্দেশ আসায় বেঁকে বসল অনিমেষ। আমাদের তো বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেবার কথা, এর মধ্যে আবার নির্বাচন কেন? পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তো কুকুরে পেচ্ছাপ করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা নোংরা ব্যবস্থা, তা কি আমরা ধুয়ে খাবো ? আমিও অনিমেষের সঙ্গে একমত, আমিও তো বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য ছটফট করছি। কলেজের ছাত্রমহলে অনিমেষ ও আমার বেশ প্রভাব ছিল, আমরা উল্টো সুরে চেঁচামেচি শুরু করতেই এক দিন আমাদের দাদা গোছের একজন নেতা আড়ালে ডেকে দু'জনকে খুব ধমকালেন। তিনি বললেন, দেশের এখন যা অবস্থা, কংগ্রেসের হারবার ব্যবস্থা প্রায় সুনিশ্চিত, আমরা যদি সরকার দখল করতে পারি তা হলে অনেক সুবিধে পেয়ে যাবো। পুলিশ আমাদের কথা শুনে চলবে, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার না করে পুলিশ হবে তাদের বন্ধু, শুরু হবে কৃষি বিপ্লব...।

শেষ কথাটা তিনি বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি ডিবেটিং সোসাইটি নয়। ওপর মহলের নির্দেশ যদি মানতে না পার, যাও, প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে গিয়ে যোগ দাও !

'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটা ছিল চরম গালাগাল ! শব্দটা আমাদের গায়ে ছেঁকা দিয়েছিল। তবে কি আমাদের ভাবনায় ভুল ছিল ? আমরা জুড়ে গেলাম নির্বাচনের কাজে। রাত জেগে পোস্টার লিখেছি, সুযোগ পেলেই অন্য দলের পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছি। বাবা আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ, বাবা বাংলা কংগ্রেসের মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তা জেনে তাচ্ছিল্যে আমার ঠোঁট বেঁকে যেত !

অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। এত দিনের পুরনো পার্টি, এত বড় সংগঠন, শিল্পপতিদের কাছ থেকে আদায় করা ঢালাও টাকা, তবু যে কংগ্রেস এমন শোচনীয়ভাবে হারবে তা আমাদের নেতারাও সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেননি। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনরা সব ধরাশায়ী।

আমাদের জোট অবশ্য গরিষ্ঠতা পায়নি। তবু কংগ্রেসকে যে-কোনও উপায়ে সরাতেই হবে বলে অকংগ্রেসী দুই ফ্রন্টের নেতারা এক সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, জোড়াতাড়া দিয়ে একটা মন্ত্রিসভা গড়া হল, বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের জ্যোতিবাবু উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ দফতর তাঁর হাতে। সি পি আই আর অন্যান্য দলগুলিও একটা-দুটো মন্ত্রিত্ব পেল। দর কষাকষিতে আমাদেরই জিত হল বলা যায়, বৃদ্ধ জরদ্গব অজয় মুখার্জি অর কী মুখ্যমন্ত্রিত্ব করবেন, জ্যোতিবাবুর হাতেই তো আসল ক্ষমতা। পুলিশকে হাতে রাখতে পারলে আমাদের সংগঠন অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে !

www.BanglaBook.org

বাবা মুচকি হেসে আমাকে বলেছিলেন, দেখলি, শেষ পর্যন্ত হাতে হাত মেলাতে হল তো ? তা হলে তোরাও সুবিধাবাদী কিংবা সংশোধনবাদী ? অবস্থা বুঝে সবাইকেই সংশোধন করতে হয় ।

ইতিহাসের কতকগুলি অদ্ভুত খোঁচ থাকে । একটু ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করলে ভবিষ্যৎ অন্যভাবে গড়া যায় । ওই জগাখিচুড়ির যুক্তফ্রন্ট যে কিছুতেই টিকতে পারে না, তা কি আগে থেকে বোঝা উচিত ছিল না ? তেলে-জলে কখনও মিশ খায় ? গান্ধীবাদী অজয় মুখার্জির সঙ্গে স্টালিনপন্থী জ্যোতি বসুর পক্ষে কি পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব ? যে সি পি আই নেতাদের নিয়ে দুদিন আগেও ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা হয়েছে, এখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেঁতো হাসি হাসলে কোনও কাজ হয় ? আমাদের পার্টি যদি এই সরকারে যোগ না দিত, দূরে সরে থাকত, তা হলেও অন্য সরকার কিছুদিন পরে ভাঙতই, পরবর্তী নির্বাচনে সি পি এম অনেক বেশি শক্তি বৃদ্ধি করতে পারত । কিংবা একেবারেই সরকারে যোগ না দিয়ে আমাদের পার্টি শুরু করতে পারত শ্রেণীসংগ্রামের প্রস্তুতি । মোট কথা, সেবারে সি পি এম যুক্তফ্রন্টে যোগ না দিলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের জন্ম হত না, আমার মতন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আগুনে ঝাঁপ দিত না । ইতিহাস অন্যরকম হত ।

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনার সময় তখন ছিল না । ওপর মহলের নেতারা তখন সবাই বহুবার জেল খেটেছেন, বিরুদ্ধ পক্ষের রাজনীতি করে করে ক্লান্ত, ক্ষমতার আসন এত কাছ থেকে হাতছানি দিচ্ছে, একবার সেই নরম গদিতে বসার সুখ পেতে চাইলেন । ঠিক যেমন ক্লান্ত, বৃদ্ধ নেতারা সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের সর্বনাশা প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, ঠিক সেই একইভাবে রাইটার্স বিল্ডিংসের কামরায় গিয়ে বসলেন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা ।

মাত্র ন মাস টিকেছিল সেই যুক্তফ্রন্ট । সেই ন মাসের ইতিহাস কুৎসিত গালাগালি, দলাদলি, নোংরা ছোঁড়াছুড়ি ও অকর্মণ্যতার ইতিহাস । তারই মধ্যে শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হল কমিউনিস্ট নেতাদের হাত ।

আমার হঠাৎ খুব জ্বর হয়েছিল, তিন দিন জ্বরের মধ্যে এমন আচ্ছন্ন ছিলাম যে খবরের কাগজও পড়িনি । অনিমেষ বহরমপুরে গিয়েছিল, ফিরে সোজা আমার বাড়িতে এসে উত্তেজিত ভাবে বলল, কী কাণ্ড হয়েছে, জানিস খোকা ? এই ব্যাপ !

অনিমেষের ডাকনাম অপু, আমরা পরস্পরকে তখন ডাকনামেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাকি। অপু আমাকে একটা লিফলেট পড়াল, সেটা যেন রক্তের অক্ষরে লেখা। 'শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতি' বিলি করেছিল সেই লিফলেট, তার থেকে জানতে পারলাম নকশালবাড়ির প্রকৃত ঘটনা !

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তখন সবে তিন মাস চলছে। নির্বাচনের আগে যদিও আমাদের ক্ষোভ ছিল, কিন্তু এই সময় যুক্তফ্রন্টকে জনপ্রিয় করার জন্য ছাত্ররা প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে জোতদারদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পুলিশের সাহায্য নিয়ে বেআইনি মজুত ধান উদ্ধার করে তা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বাজারে। কংগ্রেস কখনও এধরনের কাজ করেনি, এটা আমাদেরই বৈপ্লবিক প্রয়াস। ছাত্ররা জোতদারদের গোলা খালি করার কাজে নেমে পড়েছে। এরই মধ্যে আকস্মিক এক বজ্রপাত !

উত্তর বাংলার আদিবাসী ভাগচাষীদের ওপর জোতদারদের অত্যাচার চলছে অনন্তকাল ধরে। খুন-জখম অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। যুক্তফ্রন্ট জমানায় কি সে অবস্থা পাল্টাবে না ? ঘটনা ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

বিগুল কিষান নামে এক গরিব চাষীকে পাওনা ধানের দাবিতে বাড়িতে ধরে রেখে দেয় জোতদারবাবুরা। আগে এরকম কতবার হয়েছে, বেঁধে রাখা, চাবুক মারা, বাড়িতে আগুন লাগানো এই সবেরই তো অধিকার ছিল জোতদারবাবুদের। কিন্তু এখন জমানা পাল্টে গেছে না ? স্থানীয় কৃষকরা দল বেঁধে তীর-ধনুক, লাঠি-সড়কি নিয়ে ধেয়ে এল বিগুল কিষানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। জোতদারবাবুরা গুলি চালিয়েও ভয় দেখাতে পারল না, বিগুল কিষান উদ্ধার পেয়ে গেল, জনতার রোষে নিহত হল এক জোতদার। এর পরেই আচমকা এক পুলিশ বাহিনী গিয়ে হামলা চালালো গ্রামে। এলোপাথাড়ি গুলিতে মারা গেল এগারো জন কৃষক, তাদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা। আমরা স্তম্ভিত !

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা তখন কথায় কথায় ষড়যন্ত্রের ভূত দেখছেন। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার যে কোনও ছুতোয় পশ্চিমবাংলায় এই যুক্তফ্রন্টকে ফেলে দেবে, এই আশঙ্কা সর্বক্ষণ রয়েছে তাঁদের মনে। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম অকংগ্রেসি সরকার, তাও জোড়াতালি দেওয়া, তা কেন্দ্র সহ্য করবে কেন ? যুক্তফ্রন্টের বামপন্থী নেতারাও মন্ত্রিত্বে অনভ্যস্ত, এতকাল বিরোধী রাজনীতি করে এসেছেন, ঠিক ধরতে পারছেন না কোন ছুতোয় তাঁদের পতন ঘটাবেন কংগ্রেস। একটা বড় ছুতো আইনশৃঙ্খলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ষা। যে কোনও উপায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে। এক জন বর্গাদার মারা গেছে, কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে সোনাম ওয়াংদি নামে এক জন পুলিশ অফিসারও নিহত হয়েছে, এ সব অতি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, সুতরাং কৃষকদের মেরে মেরে ঠাণ্ডা করো ! যে কোনও মূল্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা !

কিন্তু এক জন জোতদার বা একটি পুলিশ খুনের বদলায় মহিলা সমেত এগারো জন কৃষকের প্রাণ যাবে ? পুলিশমন্ত্রী যখন জ্যোতিবাবুর মতন এক জন সাচ্চা কমিউনিস্ট ? পুলিশ মারলে পুলিশবাহিনী খেপে যেতে পারে, আর এতগুলি কৃষককে মারলে কেউ খেপবে না ?

খেপে গেল ছাত্রসমাজের বড় একটা অংশ। যারা মার্কসবাদের দীক্ষা নিয়ে, মাও সে তুং-এর চিনের দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় আশু সমাজ-পরিবর্তনের আশায় বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য ছটফট করছিল। এক হিসেবে আমরা ছিলাম অত্যন্ত গোঁড়া আদর্শবাদী, কোনও রকম আপোস আমাদের পছন্দ ছিল না। বাংলা কংগ্রেসের মতন একটা অপদার্থ দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের আঁতাত আমরা মেনে নিতে পারিনি। নকশালবাড়ির ঘটনার পর আমাদের মনে হল, এই তো সেই অশুভ আঁতাতের পরিণতি !

অনেক দিন পর লন্ডনে নির্বাসনে থাকার সময় ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছি, ঘটনার মোড় তখনও ফেরানো যেত। দারুণ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ছাত্রদলকে আমাদের মূল পার্টি তখনও ধরে রাখতে পারত। জ্যোতি বসু তো কৃষকদের শত্রু নন, তাঁর সরাসরি নির্দেশেও গুলি চলেনি। পুলিশরা বরাবরই জোতদার-মালিক শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে কৃষক-মজুরদের দমন করেছে। মাত্র তিন মাসে তারা তাদের চরিত্র কী করে বদলাবে ? যুক্তফ্রন্টের পতনের ভয় না পেয়ে প্রকৃত কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা যদি কৃষকদের সমর্থনে একযোগে গর্জে উঠতেন, তা হলে তাঁরা আমাদের মতন ছাত্রদেরও সঙ্গে পেতেন। কিন্তু পরবর্তী কার্যকলাপ আরও ছড়িয়ে ছিল বারুদ।

বরাবর কৃষক দরদী হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ কোঙারও যুক্তফ্রন্টের এক জন মন্ত্রী। ঘটনার সরেজমিন তদন্ত করার জন্য তিনি এলেন উত্তরবঙ্গে। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন প্লেন থেকে নেমেছেন, ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল তাঁকে একটা স্মারকপত্র দিতে। ছাত্রনেতা কিষান চ্যাটার্জি পুরনো পরিচয়ের সূত্রে বললেন, কমরেড, আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা ছিল।

www.BanglaBook.org

হরেকৃষ্ণ কোঙার সজোরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আমি এখানে কমিউনিস্ট হিসেবে আসিনি, মন্ত্রী হিসেবে এসেছি !

মাত্র তিন মাসের মধ্যেই মন্ত্রিত্বের জন্য এত গর্ব ! মন্ত্রী হলে আর তাঁকে কমরেড বলা যাবে না ?

প্রমোদ দাশগুপ্ত এসেছিলেন পার্টির জেনারেল বডির মিটিং করতে। সেই একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি এসেছেন নিহত পুলিশ অফিসার সোনাম ওয়াংদির শবদেহে পুষ্পস্তবক দিতে। পার্টির সভায় অনেকে হইচই করে দাবি জানালো, নিহত কৃষকদেরও শবদেহে পুষ্পস্তবক দিতে হবে, প্রমোদবাবু নিজে গিয়ে দিন, এবং অজয়বাবুকেও দিতে বলুন। প্রমোদ দাশগুপ্ত সে দাবি গ্রাহ্য করলেন না। এই দাবি কি অযৌক্তিক ছিল ? কেন রাজি হলেন না প্রমোদবাবু ? সে সভায় হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম', 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'কমরেড মাও সে তুং যুগ যুগ জিও', এই সব স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে গেল একদল।

সেই শুরু হল বেরিয়ে যাওয়া। বড় গোছের নেতারা বেরিয়ে যাবার আগেই পার্টি থেকে তড়িঘড়িতে তাদের বহিষ্কার করা হল। আমরা পরিচিত হলাম 'নকশাল' হিসেবে। নকশালবাড়ি নামে এক অখ্যাত, অনুন্নত জায়গার নাম জেনে গেল সারা পৃথিবী।

এর পরের ইতিহাস আর বিস্তৃতভাবে বলার দরকার নেই। তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমি কী করে এর মধ্যে এলাম আর কী কী কাজে অংশ নিয়েছি, শুধু সেটুকুই বলতে চাই।

ঢাকুরিয়া রেল ব্রিজের পাশে রামচন্দ্র স্কুলে সারা বাংলা ছাত্র প্রতিনিধিদের একটা সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে বিপ্লবী ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য ঘোষিত হয়েছিল।

তার পরেই অপু কলেজ ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। আমাকে কিছু না জানিয়ে। আমার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল তখন। এর আগের কয়েকটা বছর আমরা পরস্পরকে না জানিয়ে এক পাও হাঁটিনি। অপু ভেবেছিল, বাবা-মায়ের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। তা ছাড়া কলকাতায় আমার জন্ম, পুরোপুরি শহুরে ছেলে, গ্রামে গিয়ে থাকতে পারব না আমি।

বহরমপুরে গিয়ে অন্য বন্ধুদের কাছে সন্ধান পেলাম অপুর। কাঁদি থেকে মাইল সাতেক দূরে একটা গ্রামে ও আস্তানা নিয়েছে। খুঁজে খুঁজে ঠিক সেখানে পৌঁছবার পর আমাকে দেখে অবাক হল না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপু। হাসলো। ওর সেই লাজুক ধরনের রহস্যময় হাসি। অপুকে দেখলে বোঝাই যেত না। ওর মধ্যে অমন একটা কঠিন বিশ্বাসের জায়গা আছে।

লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে এক চাষীর বাড়ির দাওয়ায় বসেছিল অপু, স্লেট-পেন্সিল নিয়ে পড়াচ্ছিল সে বাড়ির তিনটি বাচ্চাকে। অপু বলল, আয় খোকা, বোস একটু, এদের পড়ানোটা শেষ করে নিই।

একটা কলাই করা বাটিতে মুড়ি খাচ্ছিল, বাটিটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। একটা আধখাওয়া কাঁচালঙ্কা আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে খা।

মুড়ি জিনিসটা কোনও দিনই আমার তেমন পছন্দ নয়। বড্ড বেশি চিবুতে হয়, কিন্তু গ্রামে থাকতে গেলে তো মুড়ি খাওয়া অভ্যেস করতেই হবে। কাঁচালঙ্কাটায় এক কামড় দিয়েই আমার পিলে চমকে উঠেছিল। বাপ রে, এত ঝাল আমি জীবনে খাইনি! ঝাল আমার একেবারে সহ্য হয় না।

দুদিন থেকে গেলাম সেই বাড়িতে। চাষী পরিবারটি এমন আন্তরিক আপন আপন ব্যবহার করেছিল, যা চিরকাল মনে থাকবে। মাত্র পাঁচ বিঘে নিজস্ব জমি, তাতে সাত জনের পরিবারের সারা বছর খোরাকির ধান হয় না, মাঠের কাজ না থাকলে জন-মজুরি করে, বউটি ঠোঙা বানায়, সারা বছরই অভাব, তবু ওরা হাসতে জানে, অতিথিকে যত্ন করে। দারিদ্র্যের মধ্যেও ওদের হৃদয় হারিয়ে যায়নি।

রাত্তিরবেলা উঠোনে দুটো খাটিয়ায় আমরা পাশাপাশি শুয়ে থাকতাম। নভেম্বর মাসে একটু একটু হিম পড়তে শুরু করেছে, ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি। অপুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই আমাকে বাদ দিতে চেয়েছিস?

অপু বলেছিল, না রে, তোকে বাদ দেব কেন? শুধু আমি প্রথমে এসে দেখে নিতে চেয়েছিলাম, ঠিক সহ্য করতে পারা যাবে কি না, গ্রামের মানুষ কীভাবে নেয় ব্যাপারটা, তারপর ডেকে নিতাম তোকে। দ্যাখ খোকা, এত ভাল সাড়া যে পাবো, আশাই করিনি। আমি পয়সাকড়ি কিছু আনিনি ইচ্ছে করে, পয়সা দিয়ে চাষীর বাড়িতে থাকাটা একটা বিলাসিতা। ছেলেমেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে এরা আমাকে খেতে দেয়। কিন্তু পড়ানোটা তো আমার আসল কাজ নয়। গ্রামে গ্রামে আমাদের কেন্দ্র গড়ে তুলতে না পারলে কোনও দিনই বিপ্লব শুরু করা যাবে না। কৃষকদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে সংগ্রামী চেতনা, আমরাও এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুদিন পর অপু আমাকে জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আমার গ্রামে থাকাতে ওর আপত্তি নেই, কিন্তু দু'জনে এক বাড়িতে থাকার তো প্রশ্নই নেই, এক গ্রামেও থাকা চলবে না, তা হলেই পুলিশের দৃষ্টি পড়ে যাবে! আমাকে থাকতে হবে অন্য গ্রামে, এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দু'চার দিনের জন্য নয়, প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে অন্তত একটানা ছ মাস থাকার জন্য। সে জন্য বাড়িতে বলেকয়ে সব ব্যবস্থা করে আসাই ভালো। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলে বাড়ির লোকই পুলিশে খবর দেবে।

আসবার সময় অপু বলেছিল, খোকা, সিগারেটের বদলে বিড়ি খাওয়া প্র্যাকটিস কর। পঞ্চাশ টাকার বেশি সঙ্গে রাখবি না। ছ মাস বাদে আমি হিসেব নেবো তার মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে!

আমার গ্রামে যাবার প্রস্তাব শুনে বাবা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমাদের মতন দলে দলে ছাত্র যে সি পি এম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এতে যেন খুশিই হয়েছিলেন বেশ। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে, দুই কমিউনিস্ট পার্টি আবার বিচ্ছিন্ন। মা তাকিয়ে ছিলেন উদ্বিগ্ন চোখে, বাবা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি চিন্তা করো না, আমিও তো তেলেঙ্গানায় গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছি।

অপুর নির্দেশে আমি গেলাম বীরভূমের একটি গ্রামে। বেশ বড় কৃষক পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলাম, একটা উঠোন ঘিরে পাঁচখানা ঘর, একটা গোয়াল ঘরও ছিল, কিন্তু সেটা খালি, সেখানেই আমি দিব্যি শুয়ে থাকতাম। কিন্তু টানা ছ মাস থাকতে পারিনি। প্রথম থেকেই ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল, সর্দি-কাশি আর ছাড়েই না, গ্রামের দিকে যে এত শীত পড়ে, সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না, গরম জামা-টামা কিছু আনিনি। চাষীরা গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে শীত কাটিয়ে দেয়, সেখানে আমি কি সোয়েটার গায়ে দিতে পারি? শেষ পর্যন্ত ব্রঙ্কাইটিসে রীতিমতন কাহিল করে দিল আমাকে। সেই সঙ্গে কী করে যেন দাদ ধরে গেল কোমরে আর উরুতে। সর্বক্ষণ দাদের চুলকোনি। ব্রঙ্কাইটিসে একেবারে শয্যাশায়ী হবার পরেই অপু এসে উপস্থিত। একেই বলে প্রাণের টান, আমি কোনও খবর পাঠাইনি, তবু সে আমার কোনও বিপদের কথা আন্দাজ করেছিল।

চিকিৎসার জন্য ফিরতেই হল কলকাতার বাড়িতে। এই সময় দিদি হঠাৎ বিয়ের কথা ঘোষণা করে ফেলেছে, সেই পরমজিতের সঙ্গেই। দিদি কখনও রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি, পরমজিৎও ও সবের ধার ধারে না। ওদের পরিবারের হোটেলের ব্যবসা, পরমজিৎ

www.BanglaBook.org

হোটেলেও দেখে আবার ছাব আকে। শিল্পী হিসেবে কিছুটা নামও হয়েছে তার। আমি ওই সময় দৈবাৎ কলকাতায় আসায় দিদির বিয়েতে থাকা হল। অনুষ্ঠান হল খুবই অনাড়ম্বর।

আমি আবার ফিরে যাবার জন্য ছটফট করছিলাম। গ্রামে থাকার সময় শারীরিক যত কষ্টই হোক, তবু অনুভব করেছিলাম এত দিনে একটা সত্যিকারের কাজের কাজ হচ্ছে। এর আগে আমরা শুধু স্লোগান দিয়েছি আর পোস্টার সেঁটেছি, এবার সত্যিকারের মানুষের মধ্যে কাজ। গ্রামের মানুষ আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শোনে। আমার আর অপুর মতন আরও বহু ছেলে ছড়িয়ে পড়েছে নানা গ্রামে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে মনে হয় আমরা খাঁটি বিপ্লবের সৈনিক।

একটু সুস্থ হবার পরই আবার গৃহত্যাগ। সেই জন্য ১লা মে ময়দানে মনুমেন্টের নিচে কানু সান্যালের ডাকে যখন মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করা হল, আমি আর অপু সেই সভায় যোগ দিতে পারিনি।

দ্বিতীয়বার গ্রামে যাবার আগে আমার কলেজের কয়েক জন বন্ধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তাদের এক জন দ্বিজেন বাগচি, সে তখন ছাত্র ফেডারেশনের এক জন নেতা। কংগ্রেসের ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে বেশ নাম করেছিল। সে আমাকে বলেছিল, রজত, তুই ওই সব হঠকারীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিস কেন, আমাদের মধ্যে ফিরে আয়। যুক্তফ্রন্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল, ফেইল করেছে, তা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। আমরাও তো শ্রেণীসংগ্রামের পথে এগোতে চাই, কিন্তু এ দেশের পরিবেশ অনুযায়ী আমাদের কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। 'চিন চিন' বলে লাফালেই তো চলবে না। চিনের সামাজিক কাঠামো আর ইন্ডিয়ার এক নয়। বিপ্লবও হাতের মোয়া নয়। তোরা অনিমেষ, শৈবাল, অসীমদের কথায় মাতিস, ওরা অ্যাডভেঞ্চারিজমের দিকে কেন ঝুঁকেছে, তা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছিস ? প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হিস্ট্রি আছে। অনিমেষের মা আত্মহত্যা করেছিলেন, ওর এক মামা আছে রাঁচির পাগলা গারদে, অনিমেষের মধ্যেও পাগলামির লক্ষণ ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে...

আমি দ্বিজেনকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। অপু যদি পাগল হয়, তা হলে তথাকথিত কোনও সুস্থ লোকের বন্ধুত্ব আমার দরকার নেই !

আমাদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত নানান বাঁক নিল ও বাড়তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল। পার্টির সংগঠন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা কখনও হয়নি, গোপনীয়তার কারণে সেটার প্রয়োজনীয়তাও খানিকটা ছিল। পুলিশের ধরপাকড় যখন শুরু হল, তখন জেরা ও অত্যাচারের মধ্যেও অনেকেই বিশেষ কিছু ফাঁস করতে পারেনি, কারণ তারা বিশেষ কিছু জানতই না।

কোথা থেকে নির্দেশ আসত, কে বা কারা নীতিনির্ধারণ করত, তা জানার উপায় ছিল না। অনেক সময় মনে হত, বিভিন্ন জায়গায় যে ছোট ছোট গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে, তারা নিজেরাই নিজস্ব চিন্তাভাবনায় অ্যাকশান প্ল্যান ঠিক করছে। গ্রামকে দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলার নীতির সমর্থক ছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু গ্রামের কাজে কোনও সমন্বয় হবার আগেই শহরে নানান ঘটনা শুরু হয়ে গেল কী করে? পিকিং রেডিও থেকে আমাদের বারবার উৎসাহ দেওয়া হত বলে কেউ কেউ বলত, সব নির্দেশ আসছে খোদ চিন থেকে। আমার বিশ্বাস হয়নি।

'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এই দেওয়াল লিখনের নির্দেশ কে দিয়েছিল? কলেজ স্ট্রিটে বড় বড় হরফে সেই লেখা দেখে আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম। মানতে পারিনি। পরে শুনেছি, আমাদের এক জন নেতা গোপনে চিনে গিয়েছিলেন, সেই সময় মাও সে তুং না চৌ এন লাই কে যেন খুব ধমকে দিয়েছিলেন তাঁকে। মাও সে তুং বলেছিলেন, কে বলেছে আমি তোমাদের চেয়ারম্যান? তোমাদের নিজেদের এতটুকু আত্মবিশ্বাস নেই?

লিন পি আও সে সময় চিনের পার্টি সেক্রেটারি না কোন মন্ত্রী ছিলেন, এখন ঠিক মনে নেই। সেই লিন পি আওকে বলা হত আমাদের পথের কাণ্ডারী। তাঁর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েও অনেক দেওয়াল লিখন হত, কিছুদিন পরেই এই লিন পি আও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল, একটা বিমান নিয়ে চিন থেকে পালাতে গিয়ে তার প্রাণ যায়।

আমাদের যারা প্রথম সারির নেতা, তাত্ত্বিক, যেমন চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী, কানু সান্যাল—এঁদের সঙ্গে আমাদের মতন অল্পবয়েসী কর্মীদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগই ছিল না। চারু মজুমদারকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি। অসীম চ্যাটার্জি (কাকা), সন্তোষ রাণা, বিপ্লব হালিম, মহাদেব মুখার্জি, শৈবাল মিত্র, মিহির চক্রবর্তী, দিলীপ বাগচির মতন কয়েক জন ছাত্রনেতা আমাদের কিছুটা সিনিয়ার, এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাঝে মাঝে।

www.BanglaBook.org

অসীম চ্যাটার্জি একবার দিলীপ দত্ত ছদ্মনাম নিয়ে বহরমপুরে আমাদের পরিচিত এক জনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, সেই সময় তার সঙ্গে দেখা ও অনেক কথাবার্তা হয়। অসীমের ব্যক্তিত্বে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতন একটা কিছু ব্যাপার ছিল, তার সঙ্গে কথা বললেই ভেতরটা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।

সেবারেই বর্ণাকে প্রথম দেখি, ফ্রক পরা, বেণী দোলানো একটি স্কুলের মেয়ে, তখন অবশ্য তার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। আলাপ হয়েছিল আরও বেশ কিছুদিন পরে।

অনেকেই তখন ছদ্মনাম নিতে শুরু করেছে, আমাদের যিনি সবচেয়ে কাছাকাছি নেতা ছিলেন, তাঁকে আমরা জানতাম 'বিজয়' বলে। কোনও পদবী নেই, এমনকি তিনি বলতেন আমাকে 'দাদা' বলারও দরকার নেই, শুধু বিজয় বলবে। কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে প্রায় দশ-এগারো বছরের বড় ছিলেন, শুধু একটা নাম ধরে ডাকতে অস্বস্তি বোধ করতাম, বিজয়দাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। তিনি নিজের সম্পর্কে কিছুই জানাতেন না, তবু কোন সূত্রে যেন শুনেছিলাম তিনি কোনও ইংরিজি সংবাদপত্রের নামকরা সাংবাদিক ছিলেন, সব ছেড়েছুড়ে নকশাল বিপ্লবের জ্বলন্ত মশাল হাতে তুলে নিয়েছেন। লিডার চারু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, পরে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধও ঘটেছিল।

বিজয়দাকে দেখলেই আমার মহাভারতের কর্ণ চরিত্রটা মনে পড়ত। কেমন যেন একটা ট্র্যাজিক মহত্ত্ব তাঁকে ঘিরে থাকত। বেশ লম্বা চেহারা, মুখে পাতলা দাড়ি, সব সময় পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে থাকতেন, কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। তিনি কোথায় রাত কাটাতেন, তা আমরা কখনও জানতে পারিনি, তাঁর নিজের যেন কোনও কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। বিজয়দাকে কিছু খেতে দিলে তিনি সবটাই প্রায় জোর করে তুলে দিতেন অন্যদের, যেন তাঁর নিজের কিছু না খেয়ে থাকলেও চলে। সব সময় অন্যদের স্বাস্থ্যের খবর নিতেন, কিন্তু ওঁর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলতেন, খুব ভালো, সব ঠিক আছে। আমরা বলতাম, বিজয়দার লোহার শরীর।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে সমস্ত সংগ্রামী লিটারেচার গুলে খেয়েছিলেন বিজয়দা, আমাদের বুঝিয়ে দিতেন খুব সহজ ভাষায়। আমি এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বিজয়দা, আমাদের মনে একটা খটকা আছে। এই যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু' ভাগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো, তারপর আমরাও নতুন পার্টি গড়েছি, এ ছাড়া আছে এস ইউ সি, আর এস পি, আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, সবাই নিজেদের মার্কসিস্ট বলে। এটা কী করে হয় ? মার্কসিস্টদের মধ্যেই এত ভাগ ! আমাদের ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজপুতদের সম্পর্কে বলা হত, বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি, বড় বড় রাজপুত বংশগুলির মধ্যে কোনও ঐক্য ছিল না, তাই অত বীর জাতি হয়েও মোগলদের কাছে যাচ্ছেতাইভাবে হেরেছে। আমাদের মধ্যে এত দলাদলি থাকলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বো কী করে ?

শশাঙ্ক নামে একটি ছেলে আমাকে প্রায়ই খোঁচা দিত। সে হেসে উঠে বলেছিল, রজতটা বড্ড সরল আছে এখনও !

আমি ওকে অগ্রাহ্য করে তাকিয়েছিলাম বিজয়দার মুখের দিকে।

বিজয়দা সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, বিপ্লবটা হবে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে। বিপ্লবের সময় যারা আমাদের সরাসরি বিরোধিতা করবে না, নতুন সমাজ গড়ার সময় তাদের আমরা ক্ষমা করে দেব।

ইলামবাজারে নুরুল আলমের বাড়ি ছিল আমাদের একটা গোপন আখড়া। নুরুল শুধু উৎসাহী কর্মী নয়, ওর বাড়িতে গেলে আমরা চমৎকার খিচুড়ি খেতে পেতাম।

নুরুলদের মূল বাড়ির পেছন দিকে একটা টিনের ঘর ছিল, সেখানে দুটি চৌকি পাতা। ঘরটার পেছন দিকেও একটা দরজা বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেদিকটায় একটা পুকুর ও অজস্র ঝোপঝাড়, প্রয়োজনে পালাবার বেশ প্রশস্ত ব্যবস্থা ছিল। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান থেকে বিভিন্ন কর্মীরা ওই ছোট্ট ঘরটায় এসে জমায়েত হত মাঝে মাঝে। অভিজ্ঞতার বিনিময় হত। ইয়ার্কি-ঠাট্টা হত খুব কম। আমরা উৎকট রকমের সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলাম সেই সময়টায়।

বিজয়দা সেখানে আসতেন প্রায়ই। এক দিন সন্ধেবেলা পেছনের দরজা দিয়ে এসে তিনি চৌকিতে বসলেন, কোনও কথা না বলে তাঁর ময়লা ঝোলাটা থেকে একটা চকচকে রিভলবার বার করে রাখলেন আমাদের মাঝখানে।

আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠলো। এর আগে কোনও রিভলবার হাতে নেওয়া তো দূরের কথা, এত কাছ থেকেও দেখিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে।

বিজয়দা নাটকীয়ভাবে বললেন, এটা কী ? খেলনাটেলনা নয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসল একটা আগ্নেয়াস্ত্র। এটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি নয়, আমায় কেউ দেয়নি, আমি কিনিনি। আর দু জন কমরেডের সাহায্য নিয়ে এটা আমি এক শয়তানের কাছ থেকে কেড়ে এনেছি।

আমরা স্তব্ধ হয়ে বিজয়দার দিকে চেয়ে রইলাম। সতেরো থেকে একুশ বছরের মধ্যে বয়েস, আটটি ছেলে। সবাই এসেছি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, বন্দুক-পিস্তলের ব্যাপারে কিছুই জানি না। ব্রিটিশ সরকার গত শতাব্দীতে অস্ত্র আইন করে ভারতীয়দের কাছে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেছিল। সেই থেকে অধিকাংশ ভারতবাসী অস্ত্র ব্যবহার করতে ভুলেই গেছে।

বিজয়দা আরও বললেন, এটা তোমাদের দেখাতে এনেছি বিশেষ কারণে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হতে আর দেরি নেই। সবাইকে অস্ত্র সংগ্রহের কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রচুর অস্ত্র চাই। তোমাদের এই কাজে পাঠাবার আগে আমি নিজে দেখে নিলাম কাজটা কত বিপজ্জনক। এটা আমি এক জন পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি, আমরা তিন জন ছিলাম, এক জন পেছন থেকে আচমকা জড়িয়ে ধরলো পুলিশটাকে, এক জন চেপে ধরলো ডান হাত, আমি টপ করে তুলে নিলাম। লোকটা এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, চেঁচাতে পর্যন্ত পারেনি। এ কাজে ঝুঁকি আছে ঠিকই, তবে খুব একটা কঠিন নয়। বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল, পাইপ গান যে যা পারবে জোগাড় করো। যে যে-গ্রামে কাজ করছ, সে সে-গ্রামে অ্যাকশান করবে না। একদল খবর জোগাড় করে আনবে, একদল অ্যাকশানে নামবে।

শুরু হয়ে গেল অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান। ফলাফল দেখে সবাই উৎফুল্ল। আমি দুটো অ্যাকশানে গিয়ে সার্থক হয়েছি। প্রথম দলে ছিলাম আমি, অপু আর নুরুল। সুলতানপুরে এক জোতদারের বাড়িতে একটা বন্দুক আছে, খবর এসেছিল। সে বাড়িতে তিন জন পুরুষ। হাটের দিনে তিন জনই হাটে গিয়ে মাতব্বরি করে, বাড়িতে সে সময় থাকে শুধু মেয়েরা। সন্ধেবেলা মুখে রুমাল বেঁধে আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম সে বাড়িতে। নুরুলের হাতে একটা ছ' ইঞ্চি ছোরা, অপুর হাতে একটা শাবল। লাল পাড় শাড়ি-পরা এক প্রৌঢ়া মহিলাকে সামনে দেখে অপু বললো, ভয় নেই, আমরা ডাকাতি করতে আসিনি, কারুকে মারবোও না, শুধু বন্দুকটা বার করে দিন। মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে একটা কাঠের আলমারি খুলে বন্দুকটা এনে আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকার মাঠটা দৌড়ে পার হয়ে আসার পর হাসিতে ফেটে পড়লো অপু আর নুরুল। সত্যি, হাসিরই তো ব্যাপার, এত সহজ! পাঁচ মিনিটও লাগেনি! তবে, সত্যি কথা বলছি, ওই সহজ কাজটাতেও যেন আমার দম আটকে গিয়েছিল, বুকের মধ্যে টিপটিপ করছিল অনবরত, আমি হাসতে পারিনি, অনেকক্ষণ কথাও বলতে পারিনি। আমার জীবনে প্রথম এমন একটা কাজ, যার সঙ্গে আমার পারিবারিক পরিচিতি, আমার শিক্ষা দীক্ষা কিছুই মেলে না। এই-ই তো চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ডি-ক্লাস্‌ড হতে হবে।

বন্দুকটাকে খুব ভালো করে পলিথিন শিটে মুড়ে সেই রাত্রেই ডুবিয়ে রাখা হলো নুরুলদের বাড়ির পুকুরে।

এত সহজে কার্যোদ্ধার আমাদের ঠিক মনঃপূত হলো না। পরের কাজটা সত্যিই দুঃসাহসিক। সিউড়ি শহরে প্রকাশ্য রাজপথে দুপুরবেলা আমরা এক জন সাব-ইন্‌সপেকটারের রিভলবার কেড়ে নিলাম। এবারে অবশ্য খানিকটা রক্তপাত ছাড়া আর কোনও বিপদ হয়নি। শেষ মুহূর্তে লোকটা আমার একটা হাত বজ্র আঁটুনিতে ধরে চেঁচাতে লাগলো ষাঁড়ের মতন। ও জানত যে ওর রিভলবারটা লোড করা নেই। ওকে প্রাণে মারতে পারবো না। অপু আর নুরুল ততক্ষণে খানিকটা দৌড়ে চলে গেছে, রাস্তার লোকরা দেখছে। আমার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই, আমাকে বাঁচাবার জন্য অপু ফিরে এসে লোকটার হাতে একটা কোপ মারলো ছুরি দিয়ে।

এতটা দুঃসাহস দেখাবার জন্য বিজয়দা অবশ্য আমাদের বকুনি দিয়েছিলেন। আমাদের তিন জনকে আলাদা করে দিয়ে কিছুদিনের জন্য চুপচাপ বসে থাকতে বললেন, নইলে পুলিশের নজর পড়বেই। বাধ্য হয়ে আমাকে বাড়িতে ফিরতে হলো।

সি পি এমের ছেলেদের সঙ্গে তখনও আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়নি। আমাদের কার্যকলাপের সব খবর রাখত ওরা। ওদের নেটওয়ার্ক খুব ভালো। অনেক দিন পর কফি হাউসে টহল দিতে গেছি, ওদের এক জন বিদ্রূপ করে আমাকে বললো, কী রে, তোরা কি জোতদারদের গাদা বন্দুক দিয়ে বিপ্লব শুরু করবি নাকি? বুলেটের বদলে কি লজেঞ্চুস ভরে লড়বি?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, তবে কি তোদের মতন পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির খাঁচায় নাক ঘষতে যাবো? পার্লামেন্ট তো শুয়োরের খোঁয়াড়।

সাধারণ বন্দুক-পিস্তল নিয়ে যে আর্মির গ্রেনেড-মেশিনগানের

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে লড়া যায় না, তা কি আমরা জানি না ? কিন্তু কোথাও তো শুরু করতে হবে। একবার জনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বাইরে থেকে অস্ত্র আসবে। চিন অস্ত্র পাঠাবে না ? ভিয়েতনামকে কে অস্ত্র দিচ্ছে ?

আমাদের অস্ত্র সংগ্রহের কাজ ভালোমতনই এগোচ্ছিল। কেউ কেউ বন্দুক চালানোর ট্রেনিংও নিচ্ছে। দু-একটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে এক রিটায়ার্ড সরকারি অফিসারের একটি রিভলবার ছিল, দুটি ছেলে সেটা কাড়তে গিয়েছিল। বুড়ো মানুষ, প্রায় একাই থাকেন, ওরা ভেবেছিল কোনও অসুবিধেই হবে না। কিন্তু ভদ্রলোক পুরনো আমলের দুঁদে আই সি এস অফিসার, শরীর আজও মজবুত। ছেলে দুটি ছুরি দেখিয়ে রিভলবারটি চাইলো, ভদ্রলোক টেবিলে বসে বই পড়ছিলেন, হঠাৎ ড্রয়ার খুলে রিভলবারটা বার করে বললেন, তবে রে ! ছেলে দুটি দৌড়োলো, কিন্তু পালাতে পারলো না, উনি তাড়া করে গিয়ে এক জনকে গুলি চালিয়ে মেরেই ফেললেন। পরে যখন খতম অভিযান শুরু হয়ে যায়, তখন ওই খুনি অফিসারটিকে খুন করে বদলা নেবার অনেকবার প্ল্যান হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আর পারা যায়নি।

খতম অভিযান শুরু হয়ে গেল যেন বড় তাড়াতাড়ি। নির্দেশ এসেছিল নাকি স্বয়ং চারু মজুমদারের কাছ থেকে। ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া হলো না। অস্ত্র শিক্ষা হলো না, এর মধ্যেই পুলিশের মোকাবিলা করতে যাওয়াটা কি ঠিক হলো ? চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীরা যে ভুল করেছিল, আমরাও সেই ভুল করতে যাচ্ছি না তো ? পরবর্তী কালে, অনেক পরে, মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে চারু মজুমদারের একটা তুলনা আমার মনে এসেছিল। জিন্না জানতেন, তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না, ডাক্তার বলে দিয়েছিল তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সেই জন্যই তিনি তাড়াহুড়ো করে, ভারত ভাগ করে পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আজম হতে চেয়েছিলেন। অসুস্থ, পঙ্গু চারু মজুমদারও কি সেই একই কারণে হুড়োহুড়ি করে একটা বিপ্লব শুরু করে দিতে চাননি ? এটা তখন আমি বুঝিনি। আমি তো সাধারণ এক জন কর্মী, আমাদের অন্য নেতারাও বোঝেননি ? বুঝলেও আটকাতে পারেননি ?

আমাদের বোঝানো হলো, লড়াই শুধু পুলিশ-মিলিটারির বিরুদ্ধেই হয় না, শ্রেণীসংগ্রামের সময় শ্রেণীশত্রুদেরও খতম করতে হয়। জোতদার, দালাল, ব্যবসায়ী, উকিল, বিচারপতি এই রকম যারা

www.BanglaBook.org

শোষকদের প্রতিনিধি, এদেরও বেছে বেছে খতম করতে হবে, যাতে এরা ভয় পেয়ে যায়, বিপ্লবের সময় বাধা দিতে না আসে।

কিন্তু ঠিক কাকে মারা হবে, কেন মারা হবে, কে বেছে দিচ্ছে, কে নির্দেশ পাঠাচ্ছে, এসব আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। মনে মনে প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হলেও মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় ছিল না, কেননা দেখলাম যে এই খতমের ব্যাপারে অনেকেই বেশ উৎসাহী। সব মানুষের মধ্যেই বোধ হয় রক্তলোলুপতা আছে, কেউ তাতে নৈতিক সমর্থন জানালে সেটা আরও উসকে ওঠে। খতম অভিযানে অনেক কর্মী পাওয়া গেল। সতেরো থেকে একুশ বছরের ছেলে, এরা যেমন অকাতরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, তেমনই অন্যের প্রাণ নিতেও পারে। এই বয়সটায় কেমন যেন একটা মৃত্যুঘোর লাগে, প্রাণের মূল্য তুচ্ছ হয়ে যায়। ন্যায় বা অন্যায়, যে কোনও যুদ্ধেই এই বয়সের ছেলেরাই এগিয়ে যায় টগবগ করতে করতে।

সাধারণ কনস্টেবল, গ্রামের ছোটখাটো জোতদার, কেরানি, ইনফরমার সন্দেহে বেকার যুবক, এরা সব খতম হতে লাগলো যেখানে-সেখানে। কোনও বড় পুলিশ অফিসার, কোনও বড় জোতদার বা ব্যবসায়ীর গায়ে হাতও পড়লো না। কারা যেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে খুনের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠালো। কিছু কিছু ইস্কুলে আগুন লাগানো হলো, কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থা দূষিত, বিপ্লবের পর নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে, তার আগে স্কুল-কলেজ খোলা রাখার দরকার নেই। তার ফলে স্কুল-পালানো বখাটে ছেলেদের পোয়াবারো, তারা ওপর মহলের কোনও রকম নির্দেশ ছাড়াই বোমা ফাটাতে লাগলো পাড়ার ইস্কুলে। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মিশনারিদের স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলিতে একটি আঁচড়ও পড়লো না। অর্থাৎ বড়লোকের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনো ঠিকই চলতে লাগলো, গরিবের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো বন্ধ।

এরই মধ্যে লেগে গেল কংগ্রেস, সি পি এমের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ছেলেদের সরাসরি সংঘর্ষ। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ শোনাবার পর চিন হঠাৎ চুপ।

নুরুলের ঘরে বসে এক দিন আলাপ-আলোচনা চলছে, কে কোথায় খতম হলো সেই প্রসঙ্গই বেশি। এর মধ্যে শশাঙ্ক আমাকে ফস করে জিজ্ঞেস করলো, সজ্জন, তোকে যদি বলা হয় জগদীশ আচার্যকে, মানে তোর বাবাকে খতম করতে, তুই পারবি ?

www.BanglaBook.org

একটুও দ্বিধা না করে আমি বললাম, না।

শশাঙ্ক বললো, ধর যদি খতমের তালিকায় তোর বাবার নাম ওঠে, পার্টি তোকে নির্দেশ দেয়, তা হলে ?

আমি বললাম, সে রকম কোনও তালিকা আছে নাকি ?

শশাঙ্ক বললো, হ্যাঁ আছে। নতুন করে তৈরি হচ্ছে। আমি জানি।

শশাঙ্ক প্রায়ই উত্তরবঙ্গে যায়, শিলিগুড়িতে ওর কাকা থাকে। শশাঙ্ক ভেতরের খবর জানতেও পারে। আমাদের মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কই কমরেড চারু মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছে।

আমি জোর দিয়ে বললাম, সে তালিকায় আমার বাবার নাম থাকবে কেন ? আমার বাবা এক জন কমিউনিস্ট।

শশাঙ্ক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আরে ওরকম জল-মেশানো ভেজাল কমিউনিস্টদের রাখার দরকার কী ? ওরাই বেশি ক্ষতিকর। আমি তোকে যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দে। পার্টি সেরকম নির্দেশ দিলে তুই কী করবি ?

আমি শান্তভাবে বললাম, প্রাণ থাকতে আমি কক্ষনো পার্টির নির্দেশ অমান্য করবো না।

শশাঙ্ক বললো, তার মানে ? একবার বললি, নিজের হাতে পারবি না। আবার বলছিস পার্টি যা নির্দেশ দেবে তাই শুনবি।

আমি বললাম, ঠিকই তো বলেছি। প্রাণ থাকতে পার্টির নির্দেশ অমান্য করবো না। সত্যি যদি ওরকম কোনও সিচুয়েশন হয়, আমি আগে আত্মহত্যা করবো। আমার মৃত্যুর পর যা হবার তা হোক।

শশাঙ্ক একটা ছুরি নিয়ে খেলা করছিল কথা বলার সময়। ওর হাত থেকে সেই ছুরিটা নিয়ে নিজের গলায় ঠেকিয়ে বলেছিলাম, এটা টেনে দিতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না।

আমি জানতাম, আমাকে মরতেই হবে। আমি মনে-প্রাণে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, এর থেকে আর ফেরা যায় না। বিপ্লব কোনও পিকনিক নয়। বিপ্লবে যারা অংশগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে ক'জন বিপ্লবের পরবর্তী ফল ভোগ করতে পারে ? ফল ভোগ করবে পরবর্তী প্রজন্ম। বিপ্লব তার নিজের স্থপতি-মিস্তিরিদের বাঁচিয়ে রাখে না। রেভোলিউশান ডিভাউরস ইটস্ ওউন চিলড্রেন।

আমি যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছি, সেটা একটা মিরাক্‌ল বলা যেতে পারে। অন্তত তিনবার মৃত্যু একেবারে মুখের সামনে হাঁ করে এসেছিল। অবশ্য আর কিছুদিন চললে মিরাক্‌লও আর খাটত না।

www.BanglaBook.org

এখন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে। বাঁচার জন্যই তো এই আত্মগোপন!

তখন একটা কথা উঠছিল যে, খতমের অভিযানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অল্প শিক্ষিত বা গ্রামের ছেলেদেরই কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের মতন শহুরে, লেখাপড়া জানা, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা গা বাঁচিয়ে আছি। কখনও কখনও লুমপেন প্রলেতারিয়েতদের সামনে ঠেলে দিচ্ছি, কিন্তু নিজেদের হাত পরিষ্কার। অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও শ্রেণীবৈষম্য রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের কাজে সবাই সমান অংশীদার, সকলের হাতেই রক্ত লাগাতে হবে।

হঠাৎ একটা অ্যাকশানে যাবার ডাক এলো।

সেই পুরনো তিন জনের টিম, অপু, নুরুল আর আমি। কে খতম হবে, কী তার পরিচয়, কোন্ অপরাধে তাকে প্রাণ দিতে হবে, এসব কিছুই আমরা জানি না। পার্টির কতটা ওপর মহল থেকে নির্দেশ এসেছিল তাও বুঝতে পারিনি। বিজয়দা তত দিনে ধরা পড়ে গেছেন। শশাঙ্কর মুখে শুনলে হয়ত একটু সন্দেহ হত, শশাঙ্কও তখন যাচ্ছে অন্য একটা অ্যাকশানে, আমাদের নির্দেশ দিলেন ইন্দ্রজিৎ নামে একটু ওপরের সারির এক জন নেতা।

যেতে হবে হাওড়ায়। হাওড়ার কিছুই আমরা চিনি না। আমাদের সাহায্য করার জন্য অন্য একটি দল ছিল, তারা স্থানীয়। তারা ভিকটিমের গতিবিধি সব লক্ষ করেছে। আমরা তিন জন দু দিন ওদিকের রাস্তাঘাট ঘুরে দেখে এলাম, যাতে একজিট রুট পেতে ভুল না হয়।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম একটা বাস স্টপে। যেন আমরা তিন জনেই আলাদা আলাদা যাত্রী, নিজের নিজের রুটের বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। শীতকাল, বিকেল শুরু হতে না-হতেই অন্ধকার হয়ে আসে। আমাদের তিন জনের গায়েই চাদর জড়ানো, কোমরে ছুরি গোঁজা। চারু মজুমদার সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর বেশি নির্ভর না করতে বলেছেন। দেখা গেছে, পিস্তল বা পাইপ গান নিয়ে যারা খতম অভিযানে গেছে, তাদের অনেকেরই টিপ ঠিক নেই, ঠিকমতন গুলি বেরোয় না, কেউ কেউ ধরা পড়ে গেছে ওই অবস্থায়। ছুরিই বেশি নির্ভরযোগ্য। নুরুলের কাঁধে একটা ব্যাগ।

বাস স্টপের উল্টো দিকেই একটা গলি। ঠিক পাঁচটা বেজে দশ মিনিটে গলি থেকে বেরিয়ে এলো এক জন মাঝবয়েসী লোক, নস্যি রঙের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা, দুটোই বেশ মলিন, মোটাসোটা চেহারা, চোখে চশমা। একটু দূরে একটা শিসের শব্দ হতেই আমরা ছুটে

www.BanglaBook.org

গেলাম লোকটির দিকে।

নুরুল একটা বোমা ফাটিয়ে পরিষ্কার করে দিল রাস্তা। অপু ওর ভোজালিটা ঢুকিয়ে দিল লোকটার পেটে, লোকটা দড়াম করে চিত হয়ে পড়ে গেল। একটা বিপত্তি হলো এই যে, অপু ওর ছুরিটা ধরে আবার টানতেই খুলে বেরিয়ে এলো শুধু হ্যান্ডেলটা। ছুরিটা পেটের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে গেছে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই, এই অবস্থাতেও মানুষ বেঁচে যায়। নিয়ম হচ্ছে ছুরিটা পেটের মধ্যে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে লিভার, কিডনি, লাংস সব একসঙ্গে জখম হয়।

আমি বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। একটু সময়ের কথা আমার মনে নেই। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, নিজের ছুরিটা পর্যন্ত বার করিনি। সব দেখছি, অথচ নিজে যেন সেখানে নেই।

লোকটির দু' পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছে অপু, নুরুল তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা মাটিতে চেপে রেখেছে। কী বলে যেন চেঁচাচ্ছে লোকটা। অপু বললো, কী হলো, খোকা, ওর গলাটা কেটে দে!

আমি তবু যেন শুনতে পাচ্ছি না। নুরুল ধমক দিয়ে বললো, এই শুয়ার, দেরি করছিস কেন, গলাটা কাট!

আমি বসে পড়লাম মাটিতে। লোকটির ফোলা ফোলা মুখ থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে! ভুরু উঠে গেছে অনেকখানি ওপরে। ঠোঁটের কোণে ফেনা।

মাথাটা সরিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে সে বলল, মেরো না, বাবা, আমাকে মেরো না। আমি কী দোষ করেছি? বাঁচতে দাও, আমার বড় দরকার।

আমি ছুরিটা চওড়াভাবে তার গলায় বসিয়ে দিয়ে টানতে লাগলাম কয়েকবার। দু-একবার ঘড় ঘড় করার পর তার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, ছিন্ন হয়ে গেল কণ্ঠনালি।

নুরুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতে হয়েছে?

অপু বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে, চল এবার!

আমার দু হাত রক্তে ভরা, মুছে নিলাম লোকটারই জামায়। ছুরিটা এত নোংরা হয়ে গেছে যে নিতে আর ইচ্ছে করলো না।

দাঁড়িয়ে উঠে তিন জন একসঙ্গে বললাম, নকশালবাড়ি লাল সেলাম!

পালানো খুব সোজা। নুরুল পরপর তিনটি বোমা ফাটালো। অত দরকার হয় না, নকশাল শব্দটা শুনলেই লোকে ভয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানলা-দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা ধীরভাবেই হেঁটে ঢুকলাম আর একটা গলিতে, তারপর একটা বড় বাড়ির পেছন দিয়ে ছুটতে ছুটতে জি টি রোড, সেখানে দুটো সাইকেল রিকশা নিয়ে বেলুড় স্টেশন।

যেতে যেতে রিকশাতেই আমার বমি হলো। তারপর তিন দিন খেতে পারিনি কিছুই, বারংবার বমি হয়েছে। লোকটির চোখ দুটি আমাকে হানা দিয়েছে অনবরত।

আমরা অনেকেই নিজেদের ঠিকমতন চিনি না। তত্ত্বগতভাবে শ্রেণীশত্রু খতমের কথা আমাদের বোঝানো হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, অন্যরা, আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা যা পারে, আমি তা পারবো না কেন ? কিন্তু সবাই সব কিছু পারে না। সব কাজ সবাইকে দিয়ে করাবার চেষ্টাটাও ঠিক নয়। মাও সে তুং কালচারাল রেভোলিউশানের নামে এই ভুলই করেছিলেন, যা পরে চিনের অন্য নেতারাও স্বীকার করেছেন।

সেই দিনের পর থেকে আমি আর আগের রজত রইলাম না।

পরে কাগজে পড়েছিলাম, আমার হাতে নিহত মানুষটি ছিলেন একটি স্কুলের হেডমাস্টার। রিটায়ার করেছেন কয়েক দিন আগে। নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে স্কুলে এসেছিলেন, তাঁর পকেটে ছিল বত্রিশ হাজার ক্যাশ টাকা। পরের সপ্তাহে তাঁর মেয়ের বিয়ে। সেই টাকাটা পাওয়া যায়নি।

আমরা কেউ ও টাকা ছুঁইনি, ও ধরনের নোংরা কাজ আমরা করিনি কখনও। লাশটা পড়ে থাকার সময় কোনও চোর-ছ্যাঁচোড় টাকাটা সরিয়েছে।

কিন্তু এক জন রিটায়ার্ড প্রধান শিক্ষককে খুন হতে হল কেন ? কী ছিল তাঁর অপরাধ ? আমি জানি না, আজও জানি না। আগে কেন জানবার চেষ্টা করিনি ? আমি তখন কত ছোট ছিলাম। একুশ বছরে পা দিয়েছি। পার্টির অন্ধ অনুগামী ছিলাম। নেতাদের সঙ্গে তর্ক করার অধিকার ছিল না। বিপরীত কিছু বলতে গেলেই শোধনবাদী আখ্যা পেতে হত। একটা সেতু গড়তে গেলে কত পাথর লাগে, আমি ছিলাম সামান্য একটু নুড়িপাথর, পার্টির সামান্য কর্মী, নিজেকে সেরকমই মনে করতাম আমি।

রজত, তুমি একজন নিরীহ শিক্ষককে খুন করে একটা পরিবারের সর্বনাশ করেছ, তাতে বিপ্লবের কাজ কতটুকু এগিয়েছে ?

জানি না, জানি না, তখন কত ছোট ছিলাম। এতটা বিচারবুদ্ধি হয়নি। যে নেতারা নির্দেশ দিয়েছিলেন, দায়িত্বটা তাঁদের, আমি ছোট

www.BanglaBook.org

ছিলাম, আমি ছোট ছিলাম, আমি নিজেই তো মরে যাবার জন্য তৈরি ছিলাম !

॥ ৪ ॥

শিট, শেভ অ্যান্ড শাওয়ার। অধিকাংশ আধুনিক মানুষের সকালবেলা এই তিনটি মূলমন্ত্র। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়া। অর্ধেক পড়া হতে না-হতেই সেই কাগজ হাতে বাথরুমে। বিশ্বের যাবতীয় দুঃসংবাদগুলি পাঠ না করলে মলত্যাগ ঠিকমতন হয় না। তারপর দাঁত-মাজা, দাড়ি কামানো। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গুনগুনিয়ে একটুখানি গান।

অফিসের গাড়ি আসে ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে। সাহেবি কায়দার অফিস, দুপুরে লাঞ্চ দেয়, রজত তাই শুধু ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে যায়। দুটি টোস্ট, এক টুকরো মাখন, একটি কলা ও দুটি ডিমের পোচ। সপ্তাহে দু দিন চিঁড়ে-দুধ-কলা আর খানিকটা জ্যাম। চিনি ছাড়া চা। ব্লাড সুগার নেই, এরকম চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে বিলেতে থাকার সময়।

রজত মোজা পর্যন্ত পরে তৈরি হয়েই থাকে। গাড়ির হর্ন শুনলে জুতো গলিয়ে টক-টক করে নেমে আসে। হাতে একটা ব্যাগ। 'মা, যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে পড়ে।

গাড়িতে জি এস দত্ত নামে এক জন সহকর্মী থাকে, রজতকে দেখে মাথা নুইয়ে বলে, মর্নিং। এই সময় রাস্তা দিয়ে যত গাড়ি যায়, প্রায় সব কটিতেই থাকে রজত আচার্য আর জি এস দত্তের মতন মানুষ।

যাওয়ার পথে ওরা দুজন কোনও দিন কোনও সিনেমা বা থিয়েটার বা গান-বাজনা বা সাহিত্যের আলোচনা করে না। ওসব কিছুর যেন অস্তিত্বই নেই জীবনে, ওদের আলোচ্য বিষয় অফিস কিংবা অফিসের অন্য কোনও সহকর্মী, অথবা আবহাওয়া অথবা সাম্প্রতিক কোনও রাজনৈতিক ঘটনা।

মিশন রো, বি বা দী বাগ, চার্চ রো, নেতাজি সুভাষ রোডের অফিসগুলির সামনে গাড়ি থেকে নামে হাজার হাজার একইরকম চেহারার সুসজ্জিত মানুষ, তাদের জুতো ও মুখ সমান পালিশ করা, ভুরুর ভঙ্গিতে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। এলেবেলে পোশাক পরা, পান চিবোনো কেরানিবাবুদের আসার এখনও সময় হয়নি।

লিফটে আর পাঁচ জনের সঙ্গে, ব্যাগটা দু হাতে সামনের দিকে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গম্ভীর মুখে যখন দাঁড়িয়ে থাকে রজত, তখন তাকে দেখে কে বুঝবে, সে এক জন খুনি ? হাওড়ার রাস্তায় বিকেলবেলায় সে এক জন নিরপরাধ, হতভম্ব, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে গলা পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটে মেরে ফেলেছিল !

দা ম্যান ইন দা গ্রে ফ্লানেল সুট। আমেরিকা এবং ইওরোপের অনেক দেশে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা হোয়াইট কলার চাকরি করে। নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি ও সুখী পরিবার আছে, তারাও প্রাক্তন খুনি। কেউ পাঁচ জন, কেউ দশ বা তারও বেশি মানুষ মেরেছে, অথচ এখনকার চেহারা দেখলে তা কিছু বোঝা যাবে না।

কিন্তু তারা রাষ্ট্রসম্মত খুনি। রাষ্ট্র তাদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেয়। যুদ্ধ বাধলে তাদের ডাক পরে, তারা তখন খাঁকি পোশাক পরে লড়াই করতে যায়, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তারা যে-কোনও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতে পিছু-পা হয় না। আবার তারা ফিরে এসে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বিবেক পরিষ্কার। তারা নিজেরা যুদ্ধ বাধায়নি। ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ কিংবা রক্তপিপাসার প্রশ্ন নেই। আদর্শেরও ব্যাপার নেই, তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের হাতেও অস্ত্র ছিল, তারা লড়ে গেছে। মারো অথবা মরো।

রজত মেরেছে এক জন নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষকে।

আজকাল পঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম, মণিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশে এই একরকম হত্যালীলা শুরু হয়েছে। বাস থেকে নামিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে কুড়ি-পঁচিশ জনকে মেরে ফেলা হল। একটা গ্রামের সব মানুষকে পুড়িয়ে মারা হল, আকাশে ধ্বংস করে দেওয়া হল সাড়ে তিন শো যাত্রী সমেত বিমান। বড় বড় যুদ্ধে সিভিলিয়ান পপুলেশানে বোমা ফেলা হত না। কেউ আত্মসমর্পণ করলে তাকে মারা হত না। এখনকার বিপ্লবীদের সেসব বাছবিচার নেই। বরং নিরীহ মানুষদের হত্যা করলেই যেন তাদের গৌরব বাড়ে। নকশাল বিপ্লবীদের কাছ থেকেই কি এখনকার বিপ্লবীরা এই শিক্ষা পেয়েছে ? রজত বাইরে কখনও তা স্বীকার করবে না, কিন্তু মা যখন খবরের কাগজে রেফিউজি ক্যাম্পের ওপর জঙ্গি আক্রমণের খবর পড়ে কাঁদেন, তখন রজত ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে, নিজেকেও কিছুটা অপরাধী বোধ করে।

আরও এক ধরনের খুনি নানা পোশাকে সমাজে ঘুরে বেড়ায়।

যারা ওষুধে ভেজাল মেশায়, যারা চোরাকারবার করে, যারা চিট

www.BanglaBook.org

ফান্ড খুলে বহু পরিবারকে পথে বসায়, যাদের তৈরি উঁচুতলা বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, যারা মসজিদ কিংবা মন্দিরকে রাজনীতিতে জড়িয়ে মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, তারাও তো খুনি। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে দু-চারজন দৈবাৎ ধরা না পড়লে তাদেরও চেনবার কোনও উপায় নেই।

রজতের অবশ্য ধরা পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বিপদ-মুক্ত। একবার সে ধরা পড়েছিল, তার বিচার হয়েছে, কারাদণ্ডও ভোগ করেছে। রজতের নামে কেস দেওয়া হয়েছিল বেআইনি অস্ত্র রাখা, অগ্নি সংযোগ, বোমা বানানো, ধানের গোলা লুণ্ঠন, পুলিশকে আক্রমণ করে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া—এইরকম অনেক অভিযোগের। সে ধরা পড়েছিল বীরভূমে, হাওড়ার খুনের ব্যাপারে তাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করা হয়নি। সে খুনটা নিয়ে বিশেষ কোনও তদন্তও হয়নি। অন্য অনেক খুন নিয়ে পুলিশ তখন হিমসিম খাচ্ছিল। রজতের নামে আলগাভাবে একটা খুনের চার্জও দেওয়া হয়েছিল। নলহাটিতে এক কনস্টেবল খুনের ব্যাপারে আর পাঁচ জনের সঙ্গে। রজত সে খুনের ধারে-কাছেও ছিল না। পুলিশ এই মিথ্যে দায় প্রমাণ করতেও পারেনি।

পুলিশ ঠিক জানত, রজত অনেক গভীর জলের মাছ, মাত্র তিন বছরের শাস্তি তার পক্ষে কিছুই না। পুলিশ আবার তাকে ধরতই, বর্ণার বাবা এবং দিদির বর পরমজিতের সাহায্যে রজত চট করে লন্ডন পালিয়ে যেতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল। পাঁচ বছর পর সে যখন আবার ইংল্যান্ড থেকে ফিরলো, তখন নক্‌শাল বিপ্লব অতীত ইতিহাস। পশ্চিম বাংলায় পাকাপাকি বামফ্রন্ট সরকার। পুরনো সব রেকর্ড ধুয়ে-মুছে গেছে।

সেই ঘটনাটা জানে, এমন লোকও তো বিশেষ কেউ বেঁচে নেই।

রজতদের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম ধরা পড়ে শশাঙ্ক।

শশাঙ্কও নিজেকে ঠিক চিনত না। নিজেকে সে মনে করত কট্টর আদর্শবাদী, পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক, তার ব্যক্তিজীবন বলতে কিছু নেই। সে-ই বুক বাজিয়ে সগর্বে বলেছিল, প্রয়োজনে আমি আমার বাবাকেও খুন করতে পারি।

শশাঙ্ক আসলে ততটা কঠিন-হৃদয় নয়, কিংবা নিজের দুর্বলতাটা চাপা দেবার জন্য সে বেশি বেশি কাঠিন্যের ভাব দেখাত। পুলিশের অত্যাচার সে একেবারে সহ্য করতে পারেনি। প্রথম দিনেই গড়গড় করে বলে দেয় অনেক কিছু। শশাঙ্কর স্বীকারোক্তিতে রজত বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনিমেষ ধরা পড়েনি। ওরা দু'জনেই বিহারে চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু নুরুলের বাড়ির আখড়ার খবর জেনে যায় পুলিশ। নুরুলের বাবা তখন অসুস্থ, পুলিশ সে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে বাবাকেও পিটিয়েছিল। নুরুল পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে এক সপ্তাহ বাদে।

বিজয়দার আসল নাম আজও জানে না রজত। তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তা-ই বা কে জানে! ইন্দ্রজিৎ জেলেই মারা গেছে, ঠিক প্রত্যক্ষভাবে পুলিশের অত্যাচারে নয়। তার আগে থেকেই সাঙ্ঘাতিক আলসার ছিল, কোনও চিকিৎসা করায়নি, হঠাৎ রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। নুরুল শত অত্যাচারেও ভাঙেনি, কোনও খবর পুলিশকে জানায়নি। জেল থেকে বেরিয়ে এলো পঙ্গু হয়ে। একটা ইস্কুল মাস্টারি নিয়ে আবার সংগঠন শুরু করেছিল গ্রামে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল রজত। এই তো গত বছর নুরুল হৃদরোগে মারা গেল।

অপু ধরা পড়েছিল সবচেয়ে শেষে। প্রথমবার ধরা পড়েও সে পালিয়েছিল কৃষ্ণনগর কোর্ট থেকে। ফেরারি অবস্থাতেও অ্যাকশান চালিয়ে গেছে। বসিরহাটে মুসলমান সেজে থাকার সময় এক জন ইনফরমার তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। একটা ডাক্তারখানায় সে পেট ব্যথার ওষুধ কিনতে গিয়েছিল। প্রত্যেক ডাক্তারখানাতেই তখন জাল পাতা ছিল পুলিশের। ওখানকার এক জন কম্পাউন্ডারকে পুলিশ ভয় দেখিয়ে ইনফরমার হতে বাধ্য করেছিল। সেই লোকটি পেট ব্যথার ওষুধের বদলে অপুকে দিয়েছিল কড়া ঘুমের ওষুধ। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে বেশ ধীরেসুস্থে অজ্ঞানের মতন ঘুমন্ত অপুকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে।

পুলিশের অত্যাচার যে তখন সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার একটা সরল, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। শুধু বিপ্লবী হলে হয়তো কিছু কিছু পুলিশের সহানুভূতি পাওয়া যেত। অনেক পুলিশের ছেলেও তো যোগ দিয়েছিল রজতদের সঙ্গে। কিন্তু সাধারণ কনস্টেবল বা সাব-ইন্‌সপেকটার ধরনের নিচের-তলার পুলিশদের খুন করার পরিকল্পনা কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছিল কে জানে! কয়েক জন চুনোপুটি পুলিশকে খুন করলেই সমস্ত পুলিশবাহিনী ভয় পেয়ে যাবে? 'পলিশ তুমি যতই মারো, আইনে তোমার এক শো বারো', এই দেয়াল লিখন দেখলেই দলে দলে পুলিশ চাকরি ছেড়ে দেবে? ছেলেমানুষী চিন্তা! পুলিশের বদলে কিছু কিছু উঁচুদরের রাজনৈতিক

www.BanglaBook.org

নেতাকে খুন করলে বোধ হয় পুলিশরা খুশিই হত। তার বদলে তারা হয়ে উঠলো অতিরিক্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। এক জন পুলিশ খুন হলে অন্তত দশটা নক্‌শালকে খতম করা হবে। এরকম একটা কোড চালু হয়ে গিয়েছিল পুলিশ মহলে। রজতদের দলে সরাসরি যোগ দেয়নি, কোনও অ্যাকশানে যায়নি, শুধু চেনাশুনো ছিল কিংবা কখনও একটু আশ্রয় দিয়েছে, এই অপরাধে অনেক ছেলে পুলিশের জিঘাংসার স্বীকার হয়েছে।

মার খেয়েও অপু মরেনি। সে ছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। কিন্তু অপুর মতন ছেলে জেলে আবদ্ধ থাকা কিংবা ফাঁসির দড়িতে ঝোলার জন্য জন্মায়নি। অপুর পরিবর্তন বিস্ময়কর। কোনও দিন সে খেলাধুলো করেনি, চশমা ছাড়া কিছু দেখতে পেত না, সেই অপু শারীরিক শক্তিও দেখিয়েছে দারুণ। তার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারত না। চোখের নিমেষে লাফিয়ে পাঁচিল ডিঙোতে পারত, তার সহ্যশক্তি ছিল অসাধারণ।

আলিপুর জেল ভেঙে একসঙ্গে সাতাশ জনের পালাবার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাই ছিল অপুর। প্রায় শেষ মুহূর্তে পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠে। জেলের পাঁচিল অপুকে আটকাতে পারেনি। টপকে নেমে পড়ার পর দৌড়োতে গিয়ে অপুর পিঠে গুলি লাগে। সেই অবস্থায় সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আদি গঙ্গায়, অনেকক্ষণ ধরে জলে ভেসেছিল অপুর লাশ।

রজত তখন বন্দি ছিল বহরমপুর জেলে। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় অপু কিছুতেই রজতকে তার সঙ্গে থাকতে দিত না। সব সময় বলত, দু'জনে ধরা পড়ে কোনও লাভ নেই। আমি যদি ধরাও পড়ি, খোকা, তুই কাজ চালিয়ে যেতে পারবি। আমাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতেই হবে!

অপু ভুল বলেছিল। রজতের চেয়ে অপুর সংগঠন ক্ষমতা অনেক বেশি, তার দৃঢ়তার কাছে অনেকে মাথা নত করত। দুজনে একসঙ্গে থাকলে হয়তো ধরা পড়তে হত না। কেউ কেউ একবারও ধরা পড়েনি। রজতের ধারণা, অপু বেঁচে থাকলে আজ এক জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারত, সারা ভারত ওকে চিনত। রজত এখন সাধারণ হয়ে গেছে, অপু বেঁচে থাকত অসাধারণ হয়ে।

খুব ঘনিষ্ঠদের মধ্যে বেঁচে আছে শুধু শশাঙ্ক। শেষের দিকে সামলে নিয়েছিল সে। পুলিশ তাকে রাজসাক্ষী করার অনেক রকম চেষ্টা চালিয়েছিল। শশাঙ্ক কিছুতেই রাজি হয়নি। প্রথম দিকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বীকারোক্তিও সব সে অস্বীকার করেছে। সুতরাং শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না। অন্যদের মতন তাকেও জেলের মেয়াদ খাটতে হয়েছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে সে অন্য রাজবন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পায়।

কিন্তু শশাঙ্কর মাথাটা গেছে বিগড়ে। বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিট সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে, তারপর হঠাৎ বিড়বিড় শুরু করে, বোঝা যায় না কিছুই। তখন সে মানুষ চিনতেও ভুল করে। রজত বছরে এক বার, দু বার সিউড়িতে শশাঙ্কের কাছে যায়, খোঁজখবর নেয়। ওখানে ওদের একটা পারিবারিক বড় ওষুধের দোকান আছে, তিন ভাই এখন মালিক, শশাঙ্ক কোনও কাজ করে না, প্রতি মাসে সেই দোকান থেকে কিছু টাকা পায়। বিয়ে করেনি, সারা দিন সে কী সব লেখে, কোথাও ছাপা হয় না, শশাঙ্ক ছাপতে দেয়ও না, আপন মনে লিখে যায়। দু-একটা পৃষ্ঠা পড়ে দেখেছে রজত, পাগলের প্রলাপ ছাড়া তা কিছুই নয়।

শেষবার যখন দেখা করতে গেল রজত, শশাঙ্ক তাকে বারবার 'অপু, অপু' বলে ডেকেছে। রজত বোঝাতেই পারলো না, সে অপু নয়।

পুলিশের খাতায় নাম নেই, পুরনো কেউ নতুন করে সেই খুনের ঘটনা উল্লেখও করবে না। কুড়ি বছর আগেকার কোনও কেস নিয়ে কেই-বা মাথা ঘামায়! কুড়ি বছর ধরে বিবেকও দংশন করে না, আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায় সব কিছু। সেই ঘটনাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে বটে, আবার ভুলে যেতেও দেরি হয় না।

খুনিরা নাকি অকুস্থলে ফিরে যায় বারবার। রজত হাওড়ার সেই রাস্তায় আর কোনও দিন যায়নি। অবসরপ্রাপ্ত সেই প্রধান শিক্ষকটির বাড়ি কোথায় কিংবা তাঁর পরিবারে আর কে কে আছে, সে সব খবরও সে ইচ্ছে করে নেয়নি। এসব জানা মানেই তো অতিরিক্ত বোঝা বাড়ানো। পরিবারের প্রধানটি চলে যাবার পর সেই সংসারটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল কিনা কিংবা সেই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল কিনা, তাও রজত জানে না। এরকম ট্র্যাজেডি তো অনেকই ঘটেছে। ভদ্রলোক তো হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে হার্ট ফেইল করেও মারা যেতে পারতেন, একই পরিণতি হত তা হলে।

শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার জন্য কয়েক জন শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষকে খুন করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। হাওড়ার যে দলটি এই প্রধান শিক্ষককে স্পট করেছিল, তারা নিশ্চয়ই জানত

www.BanglaBook.org

না, উনি মাত্র কয়েক দিন আগেই রিটায়ার করেছেন। হয়তো পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবার জন্য তার পরেও আসছিলেন স্কুলে। এক জন রিটায়ার্ড শিক্ষকের বদলে এক জন কর্মরত শিক্ষককে আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। ইনফরমেশান গ্যাপ !

হাওড়ার সেই দলটিকে রজত চেনে না, তারাও রজতদের পরিচয় জানত না, এই রকমই ব্যবস্থা ছিল। তারা এখন কে কোথায় আছে, কে জানে !

রজত এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। মা আর বর্ণার কাছ থেকেও এই ঘটনাটা সে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে। সে এক জন প্রাক্তন বিপ্লবী, এই পরিচয় জানলে লোকে কিছুটা সমীহই করে, অফিসেরও কেউ কেউ জানে, সে জেল খেটেছে ছাত্র বয়সে। সে যে এক জন খুনি, তা আর কেউ জানবে না।

শুধু তার বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা হিংস্র জন্তু। মাঝে মাঝে সে রক্ত চায়। একবার যে খুন করেছে, সে দ্বিতীয় বা তৃতীয় খুন করতে পারবে না কেন ? খুন করা যে খুব শক্ত কিছু কাজ নয়, সেই জন্তুটা তা জেনে গেছে !

অফিসের কাজ মন দিয়ে করলে সেই জন্তুটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। ছেলেমেয়েদের আদর করলে, মায়ের কাছ ঘেঁষে বসলে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর সব কর্তব্য পালন করলে অদৃশ্য হয়ে যায় সেই জন্তুটা।

লাঞ্চ খেয়ে ফিরে এসে রজত একটা সিগারেট ধরায়। দিনে পাঁচটার বেশি সিগারেট খাবে না বলে বর্ণার কাছে কথা দিয়েছে। বর্ণা চলে গেছে, আট দিন হয়ে গেল, তবু রজত সে শপথ ভাঙেনি। সুবু আর জাম্পিকে দেখার জন্য বুকটা আকুলি-বিকুলি করে। টেলিফোনেও একবার কথা হয়নি, ওদের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফোন নেই। অফিস থেকে একবার বেরিয়ে সুবুর স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভেবেছিল রজত, স্কুল ছুটি হবার সময়, ছেলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলবে, কিন্তু একটা কথা ভেবে আর যায়নি। ওখানে বর্ণাও থাকতে পারে, সে নিজেই হয়তো ছেলেমেয়েদের নিতে আসে। লোকজনের সামনেই বর্ণা যদি ঝগড়া শুরু করে দেয় ... এ ধরনের নাটকীয়তা রজত একেবারে পছন্দ করে না।

যাবার সময় বর্ণা লিখে গিয়েছিল, তোমার যা খুশি করতে পারো।

কী করছে রজত ? কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে না। সেই প্রথম দিনই মোটর বাইক নিয়ে এলোমেলো ঘুরেছিল, আর বেরোয়নি এক দিনও। মদ খায়নি, অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে চুপ করে শুয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে। নিজেকে সে কষ্ট দিচ্ছে। আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকার সময় এমন না-খাওয়া, না-বিশ্রাম, না-ঘুমোনো উৎকণ্ঠা নিয়ে কষ্ট দিতে শরীরকে।

একটা বড় বাড়ির চারতলা আর পাঁচতলা, এই দুটি তলা নিয়ে রজতদের অফিস। চার হাজার স্কোয়ার ফুটের এক একটি তলা, লম্বা হলঘরের এক প্রান্তে কয়েকটি ছোট ছোট কাচের দেয়াল ঘেরা ঘর। রজত সেই রকম একটি ঘরে বসে। তার ঘর থেকে লিফট পর্যন্ত দেখা যায়।

রজত হঠাৎ লিফট থেকে নামা দু-তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো। চট করে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের ঘরের সহকর্মীকে বললো, জি এস, আমার একবার স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম, চট করে ঘুরে আসছি, ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরবো।

পেছন দিকে একটা লিফট আছে। সেদিকে যেতে যেতে রজত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো। সেই আগন্তুকটি রিসেপশান ডেস্কের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে। লিফটে উঠে রজত আপন মনে হাসলো। পুলিশ দেখলে এক সময় এইভাবে সে পালাত, অথচ যে-লোকটি এসেছে সে শত্রু নয় মোটেই, বর্ণার দিদির বর সুরঞ্জন। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত লোকজনদের মধ্যে এই সুরঞ্জনের সঙ্গেই রজতের ব্যবহার সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যেন আজ সুরঞ্জনের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

স্টেট ব্যাঙ্ক খুবই কাছে, গাড়ি নেবার দরকার হয় না। রজত হাঁটতে লাগলো।

রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটা গাড়ির জানলা থেকে বেরিয়ে এলো অনেকগুলি কাচের চুড়ি পরা একটা ফর্সা হাত। ভেতর থেকে কেউ ডাকলো, র-জত ! র-জত !

রজত থমকে দাঁড়ালো।

গাড়িতে সামনের সিটে বসে আছে সুপর্ণা। এক মুখ হাসি ছড়িয়ে সে বললো, অ্যাই, কোথায় পালাচ্ছ ?

মেয়েরা কী করে বুঝতে পারে ? কিংবা 'পালাচ্ছ' এমনিই হালকাভাবে কথার কথা !

বর্ণার চেয়ে আড়াই বছরের বড় তার এই দিদি, কিন্তু দু' জনকে মনে হয় সমবয়সী। মুখেরও খুব মিল। সদ্য চেনা লোকেরা মনে করে যমজ। বর্ণার আসল নাম সুবর্ণা, কিন্তু সু-টা সে খসিয়ে দিয়েছে,

www.BanglaBook.org

কারণ তার ডাকনাম বিনু, সেটা তার পছন্দ নয়। বিনু নাকি ছেলে-ছেলে নাম। এখন তার আর আলাদা ডাকনাম নেই।

গাড়ির জানলার কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে রজত বললো, কী ব্যাপার, এই দুপুরবেলা অফিস পাড়ায় ?

সুপর্ণা বললো, তোমাকেই তো খুঁজতে এসেছি। কাল সন্ধেবেলা ফোন করেছিলাম। তোমাদের কাজের লোক বললো, তুমি ঘুমোচ্ছো ! এখন সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ো বুঝি ?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। সুপর্ণা মনে করেছে, রজত ইচ্ছে করে ফোন ধরেনি। কিন্তু গতকাল অফিস থেকে ফিরে স্নান-টান করে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে গিয়ে রজত সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার ঘুম। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে অনেক রাত পর্যন্ত টিভি-তে বি-বি-সি'র প্রোগ্রাম দেখেছে।

ওই ঘুমের সময়টায় হারু তাকে ডাকেনি। সুপর্ণাও জোর করেনি নিশ্চয়ই। সুপর্ণার যে রকম স্বভাব, তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল হারুকে এক ধমক দিয়ে বলা, ঘুমোচ্ছে কি, যা ডেকে দে !

বর্ণার সঙ্গে তার দিদির প্রায় প্রতি দিন, প্রায় কেন, প্রত্যেক দিনই টেলিফোনে কিছুক্ষণ গল্প না করলে ভাত হজম হত না। রজত পারতপক্ষে টেলিফোন ছোঁয় না। তার ছেলেবেলায়, কলেজজীবনেও, বাড়িতে ফোন ছিল না। বাবা মনে করতেন, টেলিফোন একটা বিলাসিতার দ্রব্য। বড়লোকদের বর্ণনা করতে গেলে বলতেন, ওদের বাড়ি-গাড়ি-টেলিফোন আছে। এখন রজতের অফিস থেকে একটা ফোন বসিয়ে দিয়ে গেছে। রজতকে অনেকে ফোনে ডাকে, রজতের নিজে থেকে কারুকে ফোন করার কথা প্রায় মনেই পড়ে না।

বর্ণা যে চলে গেছে এবং কেন চলে গেছে, তা সুপর্ণা নিশ্চয়ই জানে না। ছ' দিন তারা চুপচাপ ছিল। এরপর নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে বলেই গতকাল সন্ধেবেলা সুপর্ণা ফোন করেছিল নিজে থেকে। সুপর্ণার ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা নেই। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি ঘুমোচ্ছিলে ?

রজত বললো, অফিস থেকে ফিরে হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল। ডেকে দিতে পারত।

সুপর্ণা বললো, আগের দিন বুঝি খুব রাত জাগা হয়েছিল ?

স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেলে পুরুষরা কিছুটা উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে, এরকম সবাই ধরে নেয়। না, আগের রাতেও রজত কোথাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়নি। হারুকেও সে ঘুম ভাঙাতে নিষেধ করেনি।

গাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ব্রাউন প্যাকেট। সেদিকে তাকিয়ে রজত বললো, পূজা শপিং চলছে বুঝি ?

সুপর্ণা বললো, এখনও কত বাকি ! আর যা গরম পড়েছে এ ক'দিন।

এ পাড়ায় কোনও জামা-কাপড়ের দোকান নেই। দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রী মিলে কেন রজতের অফিসে চলে এসেছে, তা এখনও বলছে না সুপর্ণা। অন্যান্য কথা চলতে লাগলো।

সুপর্ণা রজতের চেয়ে অন্তত তিন বছরের ছোট। কিন্তু সে বর্ণার দিদি, সেই সুবাদে সে রজতের সঙ্গে বড় বড় ভাব করে। প্রথম দিন থেকেই সে রজতকে তুমি বলে ডাকবার অধিকার পেয়েছে।

বিয়ের পর নতুন এক সেট মা-বাবা, দাদা-দিদি পাওয়া যায়। রজত কোনদিনই বর্ণার বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকেনি। তার মুখ দিয়ে বেরুতই না। নিজের বাবা ছাড়া অন্য এক জনকে 'বাবা' ? বর্ণার মাকে দু'-এক বার অস্পষ্টভাবে সে 'মা' বলেছে। অন্য বয়স্কা মহিলাদের তবু 'মা' বলা যায়, কিন্তু 'বাবা' বলা যায় অন্য কোনও পুরুষকে ? হয়তো এটা একটা বদ্ধমূল সংস্কার। পুরুষের সংস্কার। মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়িকে দিব্যি 'বাবা-মা' বলে ডাকতে শুরু করে।

সুপর্ণাকেও রজত 'দিদি' বলে না, নাম ধরেই ডাকে। সম্পর্কে শ্যালিকা, ঠাট্টাইয়ার্কিও করা যায়। সুবর্ণার নিজের দুই দাদার মধ্যে ছোট জন ঠিক আছে, নিরীহ মতন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক জন 'শিল্পী', রজতেরই সমবয়সী। আর বড় দাদা শঙ্করকে সে সহ্য করতে পারে না একেবারে। একটা হামবাগ। রজতকে দেখলেই নকশালদের নিন্দে শুরু করে দিত, নকশালবাড়ি আন্দোলন এ দেশের কত ক্ষতি করেছে তার ফিরিস্তি দিতে বসত। ওসব কথা শুনলেই রজতের গা জ্বলে যায়।

বন্ধুদের মধ্যে বসে কখনও রজত আত্মসমালোচনা করে, কিন্তু অন্য কারুর মুখে ভুল ব্যাখ্যা শুনতে সে রাজি নয়। নকশাল আন্দোলন নয়, বিদ্রোহ, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের রূপ নিতে পারেনি ঠিকই, কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়নি, মোটেই ব্যর্থ হয়নি। বহু প্রচলিত ধ্যানধারণাকে বিরাট ধাক্কা দেয়নি ? মানুষকে সজাগ করেনি ? এখন আর কোনও সরকার বাংলা-বিহার-অন্ধ্রপ্রদেশে চাষীদের ওপর গুলি চালাতে সাহস করবে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজতের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, না, ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়নি !

ওই শঙ্করের জন্যই রজত শ্বশুরবাড়ি যায়নি। রজতের সন্দেহ যে, ওই শঙ্কর বরানগরের গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল কি না !

পেছন থেকে সুরঞ্জন এসে বললো, আরেঃ, এই তো রজত ! ওপরে এক জন বললো, তুমি একটু আগে বেরিয়েছ, ভাবলাম, তোমাকে আর ধরা গেল না।

রজত বললো, আসল লোকের কাছে ধরা পড়ে গেছি।

সুরঞ্জন বললো, এ পাড়ায় এসেছিলাম ... খুব ব্যস্ত ? চলো না কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক, গ্রেট ইস্টার্নে।

রজত বললো, আমায় যে একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যেতে হবে।

সুরঞ্জন বললো, ঠিক আছে, কাল সন্ধেবেলা তুমি কী করছ ? ফ্রি আছ ? কাল সন্ধেবেলা চলে এসো আমাদের ওখানে, কয়েক জনকে ডেকেছি, খাওয়াদাওয়া করে যাবে—

রজত চুপ করে রইলো।

সুপর্ণা বললো, কাজ থাক বা নাই-ই থাক, কিচ্ছু শুনবো না। তোমাকে আসতেই হবে।

দ্রুত চিন্তা করে যাচ্ছে রজত, প্রত্যাখ্যান করার কিছু একটা ছুতো খুঁজছে। বিশ্বাসযোগ্য কিছু না পেয়ে বলে ফেললো, ঠিক আছে, যাবো।

সুরঞ্জন বললো, আটটা, বড় জোর সাড়ে আটটা, তার চেয়ে দেরি করো না। একটা 'শিভাস রিগ্যাল' আছে। গাড়ি রং সাইডে পার্ক করেছি, আর দাঁড়াবো না। কাল দেখা হবে।

সুরঞ্জন বসলো ড্রাইভারের সিটে। সুপর্ণা হাত বাড়িয়ে একটা হাত ছুঁয়ে দিল।

সেই স্পর্শে যেন গূঢ় কোনও বার্তা আছে।

ব্যাঙ্কে যাবার নাম করে বেরিয়েছে, একবার সেখানে যেতেই হবে। ব্যাঙ্কে সব সময়েই আলোচনার কিছু না-কিছু থাকে। হাঁটতে শুরু করলো সে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল এইবার। ছ'দিন ধরে অনেক আলোচনা, তর্ক, পরামর্শের পর ওরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছে।

বর্ণা রাগ করে চলে গেছে, সে নিজে থেকেই আবার ফিরতে পারে না। রজতের তরফে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা দেখে বোঝা গেছে, মধ্যমগ্রাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে ওদের আনতে যাবে না সে। এর মধ্যপন্থা হলো, দু জনকে অন্য কোনও জায়গায় মিলিয়ে দেওয়া। সেখানে কিছুক্ষণ মান-অভিমান, ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্নাকাটি হোক, তারপর সব মিটে যাবে। এরকম ধারণা করাটা ভুল নয়। বর্ণার দিদি-জামাইবাবু এদের দু জনকে মেলাবার সেই উদ্যোগ নিয়েছে। রজত বাজি ফেলতে পারে, কাল ওদের বাড়ি বর্ণা ছাড়া অন্য কেউ নিমন্ত্রিত থাকবে না।

রজত কেন সুরঞ্জনকে দেখেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল? কাল নেমন্তন্নর প্রস্তাব শুনেও ইতস্তত করছিল কেন? সে কি আর বর্ণার সঙ্গে কোনদিন দেখা করতে চায় না? মনে মনে ডিভোর্সের জন্য তৈরি হচ্ছে? না না, সে রকম কথা রজত একবারও ভাবেনি। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে থাকবে কী করে?

শুধু ছেলেমেয়ে নয়, বর্ণার কথাও তার মনে পড়ছে মাঝে মাঝেই। বর্ণার দিকটা ভেবে দেখতে গেলে তার তো রাগ বা দুঃখ পাবার কারণ আছেই। বর্ণার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কয়েক জন জেনে গেছে যে, রজত একটা কুৎসিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল। রজত বলছে যে, সে সজ্ঞানে কোনও দোষ করেনি। কিন্তু স্বামীর পক্ষ নিয়ে বর্ণা তার আত্মীয়দের কিছু বলতে পারছে না, কারণ তার স্বামী যে তাকেও অন্ধকারে রেখেছে। রজতের ওপর বিশ্বাসটাই টলে গেছে তার।

বর্ণার পুজোর বাজার কিছুটা বাকি রয়ে গেছে। বর্ণা টাকাপয়সা বিশেষ নিয়ে যায়নি মনে হয়। একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে বর্ণার সঙ্গে, সেই চেক বইটাও ফেলে গেছে।

রজতদের বাড়িতে ওসব পাট বিশেষ নেই। মা আর বাবা কোনদিনই পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করেননি। তবু দুর্গাপুজো একটা বড় উৎসব, একটা করে নতুন জামা বা কাপড় কেনা হত। দিদিরা এখন থাকে বম্বেতে, সেখানে কিছু পাঠানো হয় না।

কিন্তু বর্ণাদের বাড়ির প্রথা হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত যতজন আছে, প্রত্যেকের জন্য কিছু না-কিছু কিনে দিতে হবে। যারা দূরে থাকে, তাদের জন্য টাকা পাঠাতে হয়। রজত প্রথম দিকে আপত্তি করত, ইদানীং কিছু বলে না, বর্ণা ইচ্ছেমতন কেনাকাটি করে। এ বছর সবাইকে দিতে না পারলে বর্ণা যেন মনে মনে ছোট হয়ে যাবে। 'লোকের কাছে আমি ছোট হয়ে যাবো,' এই কথাটা বর্ণা প্রায়ই বলে।

বড় রাস্তায় এসে রজত থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ শিহরন হলো তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্বাঙ্গে। ঝাপসা হয়ে এলো দু'চোখ, যেন সে ঝুপ করে ঢলে পড়ে যাবে।

সামলে নিল নিজেকে, দৃষ্টি স্পষ্ট হলো, তবু ঘোর কাটলো না। দারুণ ব্যস্ত ডালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চল, অসংখ্য গাড়ি, কত রকমের ব্যস্ত মানুষ, পেভমেন্টে কত হকার। তবু রজতের মনে হলো, সব ফাঁকা, কোথাও কেউ নেই, একটা ফাঁকা ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে, একা। এই প্রান্তর এক সময় রণক্ষেত্র ছিল। আর সবাই শেষ হয়ে গেছে, শুধু রজত বেঁচে আছে একলা, স্বার্থপরের মতন।

হ্যাঁ। স্বার্থপরই তো। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সবাই অকালে হারিয়ে গেল, অপু, নুরুল, বিশ্ববন্ধু, অনন্ত, সুবিমল, আরও কত জন, সে একা বেঁচে রইলো কেন ? মাত্র তিন বছরের জেল, তার পরই ইংল্যান্ডে মোটামুটি আরামের জীবন। তার হাত-পা কিছু ভাঙেনি, শরীরের ভেতরের কোনও কলকব্জা পাকাপাকি জখম হয়নি, তার স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী স্ত্রী, দুটি ছেলেমেয়ে, সে টাই পরে গাড়ি চেপে অফিস যায়।

অপু যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালায়, তখন রজত যদি ওই জেলে থাকত, সেও কি ওদের সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করত না ? তা হলে, অপুর আগে রজতেরই গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা ছিল বেশি। রজত অপুকে আড়াল করে থাকত। অপুর জীবন ছিল বেশি দামি। অপুর মতন ছেলেরা চলে গেলে এ দেশের যে কতটা ক্ষতি, তা কেউ বুঝলো না।

কেন সেই সময় একই জেলে ছিল না ওরা দু'জনে ? রজত নিশ্চয়ই অপুকে বাঁচাবার চেষ্টা করত প্রাণপণে। আদি গঙ্গার জলে ভাসত না অপুর লাশ।

রজত তো এক জনকেও বাঁচাতে পারেনি।

সবাই চলে গেল, এখন একা একা রজত লড়াই চালাবে কী করে ? সে পারবে না, কিছুতেই পারবে না, সেই জন্যই তো রজত বর্ণার আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। তবু এক-এক সময় সমস্ত শরীর ছটফট করে ওঠে।

এই শূন্য রণক্ষেত্রে রজত একা দাঁড়িয়ে আছে। নিরস্ত্র, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত, চোখ থেকেও অশ্রুর বদলে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোঁটা। তার আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো, অপু, অপু !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

'এখন তোমার মনের সুখে যা-খুশি করতে পারো !' বর্ণার ছোট চিঠিটার লাইনগুলি মুখস্থ হয়ে আছে, মাঝেমাঝেই প্রতিটি শব্দ বুকের মধ্যে পেরেক ঠোকে।

মানুষ যে-সব ভুল করে, সব কি মনের সুখেই করে ? কখনও কখনও একটা মোহ তৈরি হয়, যুক্তি মুছে গিয়ে এক ধরনের অন্ধ গোঁয়ার্তুমি এসে যায়, কিংবা সজ্ঞানে ভুলটাকে ভুল জেনেও কিসের যেন একটা সাঙ্ঘাতিক টানে সেদিকে ছুটে যেতে হয়। সামনে হাঁ করে আছে বিপদ, তবু তো মানুষ তার মধ্যে মাথা গলায়। যারা দিনে চল্লিশটা সিগারেট খায় আর মদের নেশা করতে বসে সাত-আট পেগের কমে থামে না, তারা সবাই জানে যে নিজের শরীরের ক্ষতি করছে। নিজেরই শরীরের ক্ষতি করে মনের সুখ হয় !

মাস তিনেক আগের কথা। অন্য সহকর্মীটি সেদিন আসেনি, অফিসের গাড়িতে বাড়ি ফিরছিল রজত। ঘোর বর্ষা, যখন-তখন আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে, সে দিনটাতেও, শীতকালের বিকেলের মতন আকাশের আলো কমে গিয়েছিল, খুব মিহিন বৃষ্টি উড়ছিল ওড়নার মতন। তবে এই সময়টায় শব্দ দূষণের চূড়ান্ত, অফিস ভাঙার পর বহু গাড়ি বেরিয়ে পড়ে এক সঙ্গে, সবাই হর্ন বাজায়, গর্জন করে মিনিবাসগুলি, এমনকি মানুষরাও রাস্তা পার হবার সময় গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হল্লা করে।

বি-বা-দি বাগে বিকেলের ব্যস্ততায় মানুষ পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থা নেই। সকলেরই বাড়ি ফেরার জন্য বাস ধরা, ট্রেন ধরার তাড়া থাকে, এত গাড়ির মাঝখান দিয়েই লোকজন ছোটাছুটি করে যায়।

রজত কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ একটা বিকট ব্রেক কষার শব্দে সে আঁতকে উঠলো। রাইটার্স বিল্ডিংসের পাশ দিয়ে গাড়িগুলো বেঁকছে, এই সময় সব গাড়িই সমান স্পিড রাখে, বেশি-কম হলে সামনের-পেছনের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাবে, হঠাৎ ব্রেক চাপাও সেই কারণে বিপজ্জনক। কিন্তু কোথা থেকে যেন রজতদের গাড়ির ঠিক সামনে এসে পড়েছে একটি মেয়ে, তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস, অসম্ভব ভয়ে তার চোখ কপালে উঠে গেছে, চোখের মণি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি, হাত দুটো তুলে আছে ওপরে।

মেয়েটিকে বাঁচাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, আর কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, রজত স্প্রিংয়ের মতন উঠে, সামনের দিকে ঝুঁকে

www.BanglaBook.org

ড্রাইভারের ওপর দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরার চেষ্টা করলো। ধরতে পারলে হয়তো আরও খারাপ হত। ড্রাইভারটি অতি দক্ষ, সে একই সঙ্গে ব্রেক চেপে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে তুলে দিল পাশের ফুটপাথে, সেখানে একটি হকারের পিঠের ঠিক এক ইঞ্চি দূরে থামলো।

মেয়েটি তাতেও পুরোপুরি রক্ষা পেল না। রজতদের গাড়িটা সরে যেতেই পাশ থেকে হুস করে চলে এলো একটা ট্যাক্সি, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মেয়েটিকে।

রজত ধপাস করে বসে পড়লো আবার। তার হাত-পা এলিয়ে গেছে। বুক ভিজে গেছে ঘামে। মানুষ প্রথমে নিজের কথাই ভাবে। রজতদের গাড়ি মেয়েটিকে চাপা দিলে ক্ষিপ্ত জনতা এই গাড়ি ঘিরে ধরত, ট্রেনে হিঁচড়ে নামাত ড্রাইভারকে, রজতকে সবাই মনে করত এই গাড়ির মালিক। গাড়ি-চড়া লোকদের ওপর অনেকেরই রাগ আছে, রজতকেও ছাড়ত না, চড়-চাপড় মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত ইঁট দিয়ে থেঁতলে দিত মাথার খুলি। এটাকে কেউ অপরাধ মনে করে না, এতে কারুর বিবেকের দায় নেই।

রজতদের গাড়ির ড্রাইভার স্বপন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। ট্যাক্সিটা পালাতে পারেনি। এর মধ্যে ভিড় জমে গেছে। ট্যাক্সির ড্রাইভার তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, আমার কী দোষ, আমার গাড়ি পেছনে ছিল, আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি, নইলে পেটের ওপর দিয়ে চাকা চলে যেত ...

এ হচ্ছে সেই ধরনের ট্যাক্সি, যারা বিকেলের দিকে কোনও যাত্রী নেয় না, কেউ হাত তুলে ডাকলে তাকায় না পর্যন্ত, এই সময় একগুচ্ছ শেয়ারের প্যাসেঞ্জার তুলে অতিরিক্ত লাভ করার জন্য কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গার দিকে ছুটে যায়। এই সব ট্যাক্সির ড্রাইভাররাও হয় অতি ধূর্ত, এরকম পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই আরও দু-একবার পড়েছে। এরা জানে, জনতার প্রহার থেকে বাঁচতে গেলে আগে থেকেই চেঁচাতে শুরু করতে হয়, ভয়-পাওয়া ভাব দেখলে চলে না, তাতে অন্তত অন্যান্য ড্রাইভারদের দলে পাওয়া যায়। অবশ্য যাকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, তার আঘাত কতখানি তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলে কোনও জারিজুরিই খাটে না।

মেয়েটিকে ধরাধরি করে তুললো কয়েক জন। রজত জানলা দিয়ে একঝলক শুধু দেখলো, মুখটা বুকের ওপর ঝুলে আছে, শাড়ির এক দিকে রক্ত। রজত সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফিরিয়ে নিল, সে রক্ত

www.BanglaBook.org

দেখতে পারে না।

মেয়েটির জ্ঞান আছে, কুঁ কুঁ করে একটা চাপা যন্ত্রণার শব্দ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

রজত বললো, স্বপন, আমাদের গাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।

আরও কয়েকটি গাড়িও দরজা খুলে ওই প্রস্তাব দিয়েছে।

কিন্তু জনতার রায় হলো, ওই ট্যাক্সিতেই নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। সব সময়ই দু-একজন পরোপকারী ও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায়, তারা নিয়ে যাবে।

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর রজত খুব বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

মানুষের জীবনের কত বড় বড় ঘটনা দু-এক মুহূর্তের এদিক ওদিকের ওপর নির্ভর করে। এই স্বপন ছেলেটি বিবাহিত, তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। কোম্পানির গাড়ি চালাচ্ছে দশ বছর, ব্যবহার খুব ভদ্র। ওর কোনও দোষ নেই, তবু যদি মেয়েটি মারা যেত ওর গাড়ির চাকার তলায়, তা হলে ওকেও হয়তো মরতে হত। রজতকেও মার খেতে হত বিনা অপরাধে, কেউ তার গায়ে হাত তুললে সে যদি গোঁয়ারের মতন উল্টে মারামারি করতে যেত, তা হলে তার বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের এদিক-ওদিক। স্বপন ব্রেক চেপে স্টিয়ারিংটা এক সঙ্গে ঘুরিয়েছিল। কারুকে চাপা দিলে শুধু ড্রাইভারের দোষ হবে কেন ? যে চাপা পড়ে তারও পুরোপুরি দোষ নয়। যে-পুলিশ বাহিনী ঠিক মতন ট্যাফিক কন্ট্রোল করে না, মানুষের রাস্তা পারাপারের কোনও ব্যবস্থা রাখে না, ফুটপাথ থেকে হকার সরাতে পারে না বলে মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হয়, যে-করপোরেশান রাস্তা সারায় না, যে-সরকার এত গাড়ি চলার উপযোগী আরও রাস্তা বানায় না, এরা সবাই দোষী নয় ?

গাড়ির চাকার তলায় কেউ চলে গেলে সবাই সে গাড়ির ড্রাইভারকে মারতে আসে। ড্রাইভার যখন কারুকে বাঁচায়, কেউ তাকে পুরস্কার দেয় ? মেয়েটি তালকানার মতন এসে পড়েছিল চলন্ত গাড়ির সামনে, রজত ভেবেছিল ওকে বাঁচাবার কোনও উপায় নেই, কিন্তু স্বপন দারুণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কেউ তাকে পুরস্কার দেওয়া দূরে থাক, একটু বাহবাও দিল না।

স্বপন আবার এমন শান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি। ওরা এত মাথা ঠাণ্ডা রাখে কী করে ?

www.BanglaBook.org

সন্ধের কোটার সিগারেটটা এখনই ধরিয়ে ফেলে রজত বললো, কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল, স্বপন ! আমার এখনও বুক কাঁপছে ! মেয়েটা হঠাৎ সামনে এসে পড়লো কী করে ?

স্বপন বললো, ওই তো মুশকিল, স্যার। দৌড়োদৌড়ি করে। এত হেভি ট্র্যাফিকের মধ্যে দৌড়োলেই বিপদ হয়। মাঝ রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেও আমাদের অসুবিধে হয় না। মেয়েছেলেটি এমন ফস করে দৌড়ে এসে পড়লো সামনে।

স্বপন ভদ্রমহিলা না বলে মেয়েছেলেটি বলছে। রজত যেটুকু দেখেছে, মেয়েটির চেহারা ও শাড়িটাড়ি উচ্চশ্রেণীর নয়। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সে স্বপনদের কাছ থেকেও সম্মান পাবে না !

রজত বললো, তুমি যদি গাড়িটা ফুটপাথে তুলে না দিতে !

স্বপন বললো, তা হলে স্যার, মেয়েছেলেটিও মরত, নির্ঘাৎ। আপনার চোট লাগতে পারত।

কোনও কৃতিত্ব দাবি করছে না স্বপন। যেন ফুটপাথে গাড়ি তোলাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

পার্স থেকে এক শো টাকার একটা নোট বার করে ঝুঁকে এসে রজত বললো, তুমি এটা নাও !

স্বপন বললো, কেন, মানে, টাকা দিচ্ছেন কেন স্যার ?

রজত বললো, এমনিই তুমি এটা নাও। তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার প্রাণটাও বেঁচে গেছে।

স্বপন বললো, না, না, স্যার। আপনি টাকা দেবেন কেন ? এটা তো আমার ডিউটি।

স্বপনের গলায় দৃঢ়তা আছে, সাধাসাধি করলেও সে নেবে না। রজতের মনে পড়লো, পুজোর সময়েও সে বখশিস চায় না। তার আত্মসম্মান বোধ প্রখর। সে আর রজত একই অফিসের কর্মী, পোস্ট যাই হোক না কেন, সুতরাং স্বপন তার এক সহকর্মীর কাছ থেকে হাত পেতে বখশিস নিতে যাবে কেন !

স্বপন যে টাকাটা নিল না, তাতেও খুশি হলো রজত।

আর একটুখানি যাবার পর আবার রজতের বুকটা কেঁপে উঠলো। গাড়ির ঠিক সামনে যখন দু' হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিল মুখখানা, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, সেই মুখখানা কি তার চেনা ? আগে কোথাও দেখেছে ? হাওড়ার রাস্তায় এক প্রৌঢ় শিক্ষককে যখন গলা পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটা হচ্ছিল, তখনও তার চোখ, ভুরু, মৃত্যুর ভয়মাখা ঠোঁট, খুব যেন মিল আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরক্ষণেই সে এই চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিল। একেবারে সামনাসামনি মৃত্যু আকস্মিকভাবে এসে গেলে সব মানুষেরই মুখের চেহারা এরকম হয়ে যায়। ওই রকম অবস্থায় রজতও পড়েছে, তখন তো আর সে নিজের মুখ দেখতে পায়নি।

এর তিন দিন বাদে সেই মেয়েটিকে আবার দেখতে পেল রজত। বাঁ হাতের আধখানা প্লাস্টার করা, কপালেও একটা স্টিকিং প্লাস্টার। লায়নস রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসছে বড় রাস্তার দিকে। তা হলে খুব বেশি চোট লাগেনি।

মেয়েটির কাঁধে ঝোলানো একটি বেশ ভারী ব্যাগ। তিন দিনের মধ্যেই জখম হাত নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই জীবিকার তাড়না আছে। তেমন কিছু ভালো চাকরি করে বলে মনে হয় না। রজত অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার গাড়ি আনতে গেছে। মেয়েটি তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

রজত মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্য দিকে, যাতে কোনওক্রমে চোখাচোখি না হয়। যদিও মেয়েটির তাকে চিনে ফেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। দুর্ঘটনার দিন রজত বসেছিল গাড়ির পেছন দিকে, বেশ অন্ধকার মতন ছিল। তবু মেয়েটি যখন পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে শিরশির করে উঠলো তার শরীর। এই মেয়েটির সঙ্গে কি হাওড়ার সেই নিহত স্কুল মাস্টারটির কোনও আত্মীয়তা আছে ? মুখের কিছুটা মিল আছে ঠিকই।

তাই বা কী করে হয় ? রজত তো সেই লোকটির স্বাভাবিক মুখ ভালো করে দেখেইনি। পেটে ছুরি খাবার পর রাস্তায় পড়ে গিয়ে যখন কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছিল, মুখখানা আতঙ্কে বিকৃত, নুরুল, ওর চুলের মুঠি চেপে ধরেছিল, সেই অবস্থায় রজত একটুক্ষণ দেখেছে। সেটা আবার দেখা নাকি ?

পরদিন কাগজে লোকটির একটি ছবি বেরিয়েছিল বটে। কনস্টেবল বা কেরানি বা জোতদারদের ছবি বেরোয় না কাগজে, কিন্তু মাস্টার খুনের নিউজ ভ্যালু বেশি, সব পাঠকই পড়বে এবং আলোচনা করবে, তাই ছবি। ছোট এক কলম। কুড়ি বছর আগে দেখা সেই ছবি কারুর মনে থাকতে পারে ? রজতের কিছু মনে নেই। শুধু নামটা সে ভোলেনি। নীলকণ্ঠ ঘোষাল, এম.এ, বি.টি। সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীতে জানা গিয়েছিল, গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি মাস্টারিতে ঢুকে আস্তে আস্তে তিনি অন্য দুটি পরীক্ষা দিয়ে ক্রমে প্রধান শিক্ষক হন, ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন (এ কথাটা তো লিখতেই হয়), রিটায়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার পরেও স্কুলে এসে বসে থাকতেন, তাঁর মেয়ের জন্য টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ... ।

না, না, সেই নীলকণ্ঠ ঘোষালের সঙ্গে এই মেয়েটির মুখের মিল খুঁজে পাওয়া নেহাতই কল্পনা। অর্থহীন চিন্তা। তবু কথাটা মনে এলো কেন ? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলছে, কিছু যেন একটা যোগাযোগ আছে। নীলকণ্ঠ ঘোষালের যে মেয়েটির বিয়ে হবার কথা ছিল, এই কি সেই মেয়ে ?

রজত এবার হাসলো। মানুষের কল্পনা কত উদ্ভটই না হতে পারে। কুড়ি বছর আগে যার বিয়ে হবার কথা ছিল, সে তো এতদিনে বুড়ি হয়ে গেছে। এ মেয়েটির বয়স বড় জোর ছাব্বিশ। অথবা তিরিশই হোক !

বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছটার সময় এই মেয়েটি প্রতি দিন অফিস পাড়ায় একই পথে হেঁটে যায়। রজত আগে কোনদিন লক্ষও করেনি। রজত ব্রহ্মচারী নয়, সে মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু এই মেয়েটি চোখে পড়ার মতন নয়, সাদামাটা, মাথা নিচু করে ধীর পায়ে হাঁটে। এখন রজত প্রায়ই ওকে দেখতে পাচ্ছে। এক দিন হেঁটে এলো উল্টো দিক থেকে, ওর হাতের প্লাস্টারে কী যেন লেখা, কয়েকটা নাম, সেদিন শাড়িটা অন্য দিনের চেয়ে পরিচ্ছন্ন। রজত ওর সঙ্গে চোখাচোখি করতে চায় না, কেন চায় না ? শেষ মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিল, মেয়েটিও ওর দিকে তাকালো না।

মেয়েটি কাছাকাছি এলেই রজতের বুকটা একবার কেঁপে ওঠে। এর জন্য রজত একই সঙ্গে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়। এটা কী হচ্ছে ! রজত ঠিক নিজে না হলেও তার ড্রাইভার স্বপন মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মেয়েটা তাদের কাছে উপকৃত। তা হলে রজতের বুক কাঁপছে কেন ? প্রেমে পড়লে এমন হয়। প্রেম, হুঃ ! চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা বড় জোর একবার বিয়ে করতে পারে, তারপর আর প্রেমে পড়ার সময় নেই তাদের।

কুড়ি বছর আগে সেই নীলকণ্ঠ ঘোষালের সঙ্গে মেয়েটিকে কোনও ভাবেই যুক্ত করা যায় না। অথচ ওকে দেখলেই সেই ঘটনাটা মনে পড়ে। অবচেতনে কিছু একটা ঘটছে ? তবে তো এ মেয়েটির ধারে কাছেও আর যাওয়া উচিত নয়। যে অধ্যায়টা একেবারে মুছে গেছে, আবার তাকে রেখাচিত্রে ফুটিয়ে তোলার তো কোনও মানে হয় না !

রজত ঠিক করলো, সে আর ওই সময় অফিস থেকে বেরুবে না। ইচ্ছে করলেই সাতটা-আটটা পর্যন্ত থাকতে পারে। তখন এই সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। সুবিধেও হয়ে গেল, ইনকাম ট্যাক্সের উকিল ভদ্রলোক ক'দিন অফিসেই আসছেন, এখানেই আলোচনা চলছে।

কথা বলতে বলতে পেচ্ছাপ করার ছুতোয় রজত ঠিক সাড়ে পাঁচটায় উঠে যায়। চারতলায় বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখা যায় লায়নস রেঞ্জের মোড় ও অনেকখানি রাস্তা। পিলপিল করে ছুটছে মানুষ, তাদের মধ্য থেকে মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রজত বাজপাখির মতন চোখে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে দেখতে না পেলে সে খুবই হতাশ হয়।

বাড়িতে বর্ণা জিজ্ঞেস করে, কয়েক দিন ধরে তোমাকে অন্যমনস্ক আর গম্ভীর দেখছি কেন ?

রজত আড়ষ্টভাবে হেসে বলে, গম্ভীর ? অফিসে খুব ঝামেলা চলছে, সুইডেন থেকে বড় একটা কনসাইনমেন্ট এসে আটকে আছে পোর্টে, ছাড়ানো যাচ্ছে না, প্রতি দিন ডেমারেজ খেতে হচ্ছে।

বর্ণা বলে, তোমার মতন আর কেউ বাড়িতে এসে অফিসের চিন্তা করে ? তাও তো নিজের ব্যবসা নয়।

রাত্রে বর্ণাকে একটুখানি জড়িয়ে ধরেই রজত অন্য পাশ ফিরে শোয়। অবচেতনে কী ঘটছে তা বোঝার জন্য রজত নিজের খুব ভেতরে ডুব দেবার চেষ্টা করে, কিছুই দেখতে পায় না বলে সে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

অফিসে কাজ করতে করতে রজত হঠাৎ উঠে পড়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়। কারুকে কিছু না বলে দ্রুত বেরিয়ে আসে রাস্তায়। লায়নস রেঞ্জের মোড় ছাড়িয়ে মেয়েটি অনেকটা এগিয়ে গেছে, আজ তার হাতে প্লাস্টার নেই। সাবধানে দেখেশুনে রাস্তা পার হলো। তারপর গোলদিঘিতে ঢুকে দাঁড়ালো মিনিবাসের লাইনে।

ড্রাইভার স্বপন রজতকে খোঁজাখুঁজি করবে। করুক। লাইনে একটু দূরত্ব রেখে রজত কেন সেই লাইনে দাঁড়ালো এবং কেন সে ওই মিনিবাসে চাপলো, তা সে জানে না। সে অবচেতনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সেই দিনই রজত একবালপুরের এক বস্তির মধ্যে দোতলা একটা মাঠকোঠায় ওই মেয়েটিকে ঢুকতে দেখে এলো। একতলায় অনেক ভাড়াটে। মেয়েটি দোতলায় উঠে রাস্তার ধারের একটা ঘরের আলো জ্বাললো। জানলা দিয়ে দেখা যায় তার সিলুয়েট।

নীলকণ্ঠ ঘোষালের মুখখানা রজতের মনে নেই। কিন্তু তার

www.BanglaBook.org

গলাটা যখন সে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটে, তখন রজতের মুখখানা অনেকখানি নেমে এসেছিল, সে দেখেছিল ওই লোকটির দুই বিস্ফারিত চোখ, ঘন ভুরু, কুঁকড়ে যাওয়া কপাল। মুখের এই অংশটা সে কোনদিনই ভুলবে না। মিল আছে, সত্যি মিল আছে, সেদিন গাড়ি চাপা পড়ার আগের মুহূর্তে এই মেয়েটির মুখ ঠিক নীলকণ্ঠ ঘোষালের মতন হয়ে গিয়েছিল।

তা হলে জানা গেল, এই মেয়েটি নীলকণ্ঠ ঘোষালের মেয়ে। ঠিক আছে, জানা তো হলো। এরপর আর কী হবে? নীলকণ্ঠ ঘোষালকে রজতের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, এত দিন পর রজতের ড্রাইভারের তৎপরতায় তার মেয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শোধবোধ বলা যেতে পারে। এখন এ মেয়েটির ত্রিসীমানায় আর রজতের যাওয়া উচিত নয়!

তবু দু দিন পর আবার সে মেয়েটিকে অনুসরণ করলো।

আমেদপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে বাগচি-জমশেরপুর পর্যন্ত ইদ্রিশ আলি নামে পুলিশের এক ইনফরমারকে তিন দিন ধরে অনুসরণ করেছিল রজত। ইদ্রিশ আলিকে মারার ভার রজতের ওপর ছিল না, শুধু তার গতিবিধি জানিয়ে দেবার কথা ছিল অন্য একটি গ্রুপকে। ইদ্রিশ আলি সীমান্ত টপকে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যায়।

আরও কয়েকবার এরকম অনুসরণ করার অভিজ্ঞতা আছে রজতের। পার্টির আদেশে। সে কখনও কোনও মেয়েকে অনুসরণ করেনি, সেই বয়স আসার আগেই সে রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে, এবং তাদের রাজনীতিতে মেয়েদের মেয়ে বলে গণ্য করাই নিষিদ্ধ ছিল। যৌনতা তো দূরের কথা, প্রেম শব্দটাই ছিল ট্যাবু। যৌদ্ধ সঙ্ঘারামের মতন। এইটা ছিল আর একটা ভুল। পরে রজত বুঝেছে, অবরুদ্ধ যৌন কামনায় তাদের দলে কেউ কেউ বেশি করে হত্যালীলায় মেতেছিল।

কলকাতা শহরে অনুসরণ করাটা কোনও শক্ত ব্যাপারই নয়। কেউ কারুকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। দিনের পর দিন একই মিনিবাসে যারা যায়, তারাও কেউ কারুকে চেনে না। মেয়েটি রজতকে একবারও স্থির চোখে দেখেনি।

মেয়েটির নাম প্রভাতী ঘোষাল। নীলকণ্ঠ ঘোষাল যখন মারা যান, তখন ওর বয়স ছিল ছয়, অর্থাৎ বাবা-মায়ের বেশি বয়সের সন্তান, নিশ্চয়ই ছিল খুব আদরের। ওর ওপরে আরও দুই দাদা এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিদি। পরিবারের যিনি প্রধান, তিনি যদি বিনা নোটিসে হঠাৎ পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য হন এবং আর্থিক সচ্ছলতা যদি না থাকে, তা হলে সে পরিবারে অনেক মূল্যবোধই ভেঙে পড়ে। রিটায়ার্ড হেডমাস্টার প্রাইভেট টিউশানি করে ও নোট লিখে কিছু টাকা রোজগার করতে পারতেন, সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল, তা ছাড়া খোয়া গেল বত্রিশ হাজার টাকা, সে সময়ে অনেক টাকা, এতে পরিবারটির ওপর একটা প্রবল ধাক্কা তো লাগবেই। এই কুড়ি বছরেও এরা সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বরং সামাজিক সিঁড়িতে ক্রমশই নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

প্রভাতীর যে-দিদির তখন আকস্মিক পিতৃশোক ও টাকার অভাবে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তার নাম শুকতারা। ওদের বাবা কিংবা মা কারুর বেশ কবিত্ববোধ ছিল, মেয়েদের নাম অন্য রকম রেখেছিলেন। শুকতারা দু'বছর বাদে নিজে নিজেই একটি ভদ্রবেশী গুণ্ডাকে বিয়ে করে। আসানসোলে মাত্র দেড় বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর তার গুণ্ডা স্বামীটি একটি কয়লাখনির শ্রমিক আন্দোলন ভাঙতে গিয়ে সংঘর্ষে আহত হয়ে জেলে যায়। তার বিরুদ্ধপক্ষীয়রা তিন জনে মিলে গর্ভবতী শুকতারার ওপর বলাৎকার করে এক রাতে, শুকতারার অ্যানিমিয়া ছিল, এক সঙ্গে অত তেজ সহ্য করতে পারলো না, হাসপাতালে গিয়ে তিন মাসের ভ্রূণ সমেত চোখ বুজে সব জ্বালা জুড়িয়েছে।

প্রভাতীর দুই দাদার মধ্যে এক জন ভদ্রশ্রেণীতে রয়ে গেছে। গুমো-হাবড়ার কাছে সে এক বি ডি ও অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরি করে। উপরি আছে। বিয়ে করেছে এক পুরুতের মেয়েকে এবং ভদ্রশ্রেণীতে টিকে থাকার জন্য নিজের ভাই-বোনদের থেকে অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখেছে। মায়ের নামে সে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠায় অবশ্য।

অন্য ছেলেটির নাম সুকুমার। তার বাবার মৃত্যুর সময় সে স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি, আর তার লেখাপড়া হলো না। কুসঙ্গে মিশে সে চোর-ছ্যাঁচোড় হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে সে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েটিকে সে যথারীতি বিয়ে করে এরই মধ্যে তিনটি সন্তানের পিতা হয়েছে। কালীঘাট মন্দিরের কাছে তার ছিটকাপড়ের দোকান। কিন্তু সেই দোকান সামলাতে সে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তার অর্থবল ও শারীরিক শক্তি দুটোই কম, সেই জন্য মন্দির পাড়ায় মাস্তান এবং রাজনৈতিক দলের ছেলেরা অনবরত তার

www.BanglaBook.org

কাছ থেকে টাকা দাবি করে, পাশের একটা বড় দোকান তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাড়িতে এসে সুকুমার সব সময় বউ ও বোনের সঙ্গে খিটিমিটি করে, বাচ্চাদের অকারণে পেটায়।

নীলকণ্ঠ ঘোষাল থাকতেন শালকিয়ার একটি দোতলা বাড়িতে। পুরনো আমলের কম ভাড়ায়। তাঁর মৃত্যুর পর এই পরিবারটি সে বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, দু-তিনবার বাড়ি পাল্টে এখন আছে একবালপুরের এই বস্তিতে। হেডমাস্টারি করার সময়েও তিনি সপ্তাহে তিন দিন কোচিং ক্লাস এবং সন্ধেবেলায় আলাদা একটা টিউশানি করতেন। তাঁর উপার্জন মন্দ ছিল না। সকালবেলা তিনি বাড়ি থেকে বেরুতেন না, ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াতে বসতেন। পাঁচ-ছ বছরের আদরের ছোট মেয়েটি তাঁর কোলে, দু পাশে দুই ছেলে এবং বড় মেয়েটি সামনে। সবাইকে একসঙ্গে তিনি পড়ে শোনাতেন মহাভারত। বাবা হিসেবে তিনি বেশ কঠোরই ছিলেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ অমনোযোগী হলে কিংবা উঠে গেলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন রীতিমতন। তিনি খারাপ কথা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, রাস্তার ছেলেদের মুখে খিস্তিখাস্তা শুনলে তাদের তেড়ে যেতেন। এই পরিবারটির অধঃপতনের প্রধান চিহ্ন, এখন ঝগড়ার সময় ছেলেমেয়েরা সবাই, এমনকি বৃদ্ধা মা পর্যন্ত বিশ্রী গালাগালি উচ্চারণ করেন।

আলিপুরে মিশনারিদের একটা অবৈতনিক স্কুলে পড়াশুনো করেছে প্রভাতী। মাধ্যমিক পাস করবার পর তার কলেজে পড়ার কথা কেউ ভাবেনি। তার বিয়ের কথাই বা কে ভাবে ! তাকে চাকরি খুঁজতে বলা হয়েছিল। ঠিকমতন চাকরি সে পায়নি, বিভিন্ন অফিসে আলপিন, ক্লিপ, স্ট্যাম্প প্যাড, বক্স ফাইল ইত্যাদি সাপ্লাই করে, এমন একটা কোম্পানির সে এজেন্ট, অফিস পাড়ায় ঘুরে ঘুরে অর্ডার জোগাড় করে, সেই অনুযায়ী কমিশান পায়। মাসে আড়াই শো-তিন শো টাকার বেশি হয় না। লায়নস রেঞ্জের একটা অফিসে রোজ তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চিঠিপত্রের ঠিকানা লেখা ও পোস্ট করার একটা ফুরনের কাজও তার আছে, সে জন্য পায় দেড় শো টাকা। মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা মহিম গুপ্ত নামে এক জন লোক তাকে কোথাও নিয়ে যায়।

এই সব তথ্য পরিপাটিভাবে লেখা আছে একটি ফাইলে, সে ফাইলটি রাখা আছে রজতের অফিসে তার নিজস্ব আলমারিতে তালাবন্ধ। এত সব খবর জোগাড় করা রজতের পক্ষে অসম্ভব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রভাতীর সঙ্গে সে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি, ওদের বাড়ির দরজার কাছেও থামেনি।

দু-এক বার সে ভেবেছিল বটে যে, নীলকণ্ঠ ঘোষালের এক পুরনো ছাত্র সেজে ওদের সঙ্গে ভাব জমাবে। মাস্টারের বাড়িতে ছাত্ররা যেতেই পারে, সব ছাত্রকে কেই-বা মনে রাখে! এমন তো হতেই পারে, নীলকণ্ঠ ঘোষালের কাছে প্রাইভেট পড়ে পাস-টাস করে কোনও ছাত্র বিলেতে চলে গিয়েছিল। সেখানে সে খুব উন্নতি করেছে, অনেকদিন পর তার মনে পড়েছে বাল্যকালের প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের নাম। খোঁজ নিতে এসে সে দেখলো, মাস্টারমশাই নেই, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খুব দারিদ্র্য-দশা, তাই সে উদার ভাবে কিছু সাহায্য করতে চায়।

ভেবেছে। কিন্তু রজত সে রকম ভাবেও যায়নি। তার অভিনয় করার ক্ষমতা একেবারেই নেই। দিনের পর দিন সে এত মিথ্যে কথা চালিয়ে যেতে পারবে না। এ সব যেন গল্পের মত। গল্পেই মানায়। তা ছাড়া, সে কত টাকা সাহায্য করবে? একটা প্রাণের দাম কত?

ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকলে নীলকণ্ঠ ঘোষালের বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এটা ভাবলেও রজতের বুক ধকধক করে। বৃদ্ধা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবেন।

আজকাল অনেক সিকিউরিটি এজেন্সি হয়েছে, তারা বিভিন্ন অফিসে কিংবা বহুতল বাড়িগুলিতে দারোয়ান পাঠায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় স্বামী বা স্ত্রীর গোপন গতিবিধির খবরও এরা জোগাড় করে দেয়। সেই রকম একটা এজেন্সির ওপর রজত ভার দিয়েছিল, মাত্র সাতদিনের মধ্যে তারা প্রভাতী ঘোষাল সম্পর্কে ফাইল তৈরি করে দিয়েছে। নিখুঁত কাজ। শুধু তারা মহিম গুপ্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু খবর দেয়নি, যদিও সেটা বেশ সহজ ছিল না। রজত নিজে পরে জেনেছে যে ওই মহিম গুপ্ত কালিঘাট অঞ্চলে একজন মাঝারি ধরনের রাজনৈতিক নেতা, ঠিক নেতাও নয়, শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের পক্ষছায়ায় পুষ্ট একটি বদমাস। নির্বাচনের সময় তার ভূমিকা খুব মূল্যবান।

শুধু যে প্রভাতীকে অনুসরণ করেছে রজত তা নয়, সে কালিঘাটে সুকুমারের দোকানের সামনে দিয়েও ঘুরে এসেছে দু বার। সুকুমারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে মহিম গুপ্তকে হেসে হেসে কথা বলতেও দেখেছে, সুকুমারও বাড়ি চুলকোতে চুলকোতে হেসেছে।

রজত নিজেকেই জিজ্ঞেস করে। কেন আমি এদের পেছনে

www.BanglaBook.org

ঘুরছি ? কেন আমি সাড়ে ছ হাজার টাকা খরচ করে ওই ডোসিয়ার তৈরি করলাম ? এ তো এক ধরনের পাগলামি। আমিও কি শশাঙ্কর মতন পাগল হয়ে যাচ্ছি ?

এসব ভাবলেই তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে।

নিরপেক্ষ ভাবে সব দিক তলিয়ে চিন্তা করে দেখ রজত। অনেক পরিবারই এরকম ভাবে তছনছ হয়ে গেছে। এখন ইস্কুল মাস্টারদের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে, কিন্তু সেই সত্তরের দশকে ইস্কুল মাস্টাররা সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যেত। পাকা বাড়িতে থাকা এবং ভদ্রলোকের মতন চালচলন বজায় রাখতে হতো বলে তাদের সঞ্চয় থাকত না কিছুই। হঠাৎ একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হলে সবাই তো বিপদে পড়বেই। এরকম কত ঘটেছে। নীলকণ্ঠ ঘোষালের মৃত্যুর জন্য তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আক্রোশ ছিল না, তুমি ভদ্রলোককে চিনতেও না। বিপ্লব প্রচেষ্টা বা আন্দোলনের সময় দু-একটা নীতিগত ভুল সিদ্ধান্ত হয়েই যায়, তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ দায়ী নয়। তুমি খুনি নও, রজত।

এই পরিবারটিকে তুমি কিছুটা সাহায্য করে বিবেকের ওপর একটা প্রলেপ দিতে চাও ? কীভাবে সাহায্য করবে ? তোমার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের এখন আর যোগ নেই। দল ছাড়া একক শক্তি এখনকার দিনে তুচ্ছ ! সুকুমারকে যদি দোকানটা তুলে দিতে হয়, তুমি কী করে আটকাবে ? ও পাড়ার মাস্তানরা এখন কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলে ভিড়ে আছে, তাদের গায়ে পুলিশও হাত ছোঁয়ায় না। শাসকদলের কথায় পুলিশ ওঠে বসে, তাই গুণ্ডারাও সেই দলে গিয়ে ভেড়ে।

প্রভাতীকে তুমি সম্মানজনক কোনও চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে ? যেমন তেমন ভাবে শুধু মাধ্যমিক পাশ একটা মেয়েকে কে নেবে ? প্রভাতীর রূপের চাকচিক্য নেই, শরীরের গড়নও আহামরি নয়, ওর বিয়ে হওয়াও প্রায় অসম্ভব। এই ধরনের মেয়েদের কিছু কিছু লোক ব্যবহার করে, যতদিন যৌবনটুকু থাকে। যতদূর মনে হয়, সুকুমারই নিজের সুবিধের জন্য তার বোনকে মহিম গুপ্তর হাতে তুলে দিচ্ছে। মহিম গুপ্ত প্রকাশ্যে গাড়ি নিয়ে এসে মাঠ কোঠার বাড়ি থেকে প্রভাতীকে সন্ধেবেলা তুলে নিয়ে যায়, সুকুমার তা জানে না ? তবু সে মহিম গুপ্তর সঙ্গে কথা বলার সময় ঘাড় চুলকিয়ে হেঁ হেঁ করে হাসে। যতদিন মহিম গুপ্ত তুষ্ট থাকবে, ততদিন তার দোকান উঠবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না।

প্রভাতীও যে বাধ্য হয়ে কিংবা ঘোর অনিচ্ছার সঙ্গে মহিম গুপ্তর কাছে যায়, তাই-ই বা তুমি জানলে কী করে ? তোমার বিপ্লবী চেতনা, তোমার মধ্যবিত্ত মানসিকতা, তোমার পারিবারিক নীতিবোধ দিয়ে বিচার করছো। যারা সমাজের নিচের তলায় নেমে যায়, তাদের নীতিবোধ অন্য রকম, তারা হয়তো এটাকে খারাপ কিছু মনে করে না। যে মেয়ের বিয়ে হবার আশা নেই, সে যদি কিছুক্ষণের জন্য কোনও পুরুষের উপভোগের সামগ্রী হয়, তাতে তার আপত্তি নাও থাকতে পারে। ভালো খাবার-দাবার পাবে, কড়া ধরনের উত্তেজনা ভোগ করবে, বাড়িতে যা সে পায় না, তাই পাবে, বাড়ির দমবন্ধ পরিবেশ থেকে কয়েক ঘণ্টা দূরে থাকাও হবে। যে-সব মেয়ের স্বাস্থ্যটাও ভালো নয়, তারা এমন সুযোগ চাইলেও পায় না।

শরীর ভোগের শুচিবাই নিছক মধ্যবিত্তদের ব্যাপার, বড়লোক কিংবা গরিবরা ওসব গ্রাহ্য করে না। তোমরা তো বিপ্লব করে সমাজ পাল্টাতে পারোনি রজত, এই ব্যবস্থাই বা পাল্টাবে কী করে ? শুধু একজন মেয়ের অবস্থা পাল্টানো যায় ?

একবালপুরের মোড়ে দাঁড়িয়ে রজত দেখেছে, একটা ঝ্যারঝেরে অ্যাম্বাস্যাডর গাড়িতে মহিম গুপ্তর পাশে বসে আছে প্রভাতী, সে সময় তার শাড়িটা মলিন নয়, মুখে প্রসাধনের চিহ্ন। কী একটা কথায় খুব হাসছে। তা হলে আর প্রভাতীকে নিয়ে রজতের মাথা ঘামানোর কী দরকার ?

এই সময় যদি অপু বেঁচে থাকতো, সে ঠিক পরামর্শ দিত।

বাড়িতে সবাই জানে, সল্টলেকে ইনকাম ট্যাক্স উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে যেতে হয় বলে রজতের বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়। কিন্তু সেখানে যায় না রজত, দিনের বেলাতেই সে কাজ সেরে নেয়। কী একটা চুম্বক তাকে টেনে আনে একবালপুরের মোড়ে। একবার প্রভাতীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, দোতলার জানলা বন্ধ থাকে প্রায়ই।

একদিন মহিম গুপ্তর সঙ্গে প্রভাতীকে গাড়িতে দেখতে পেয়ে রজত ঝাট করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল।

ক'দিন ধরে একটা গানের কয়েক লাইন মনে পড়ছিল রজতের। গানটা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। অজিতেশ ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা' অনুবাদ করে 'তিন পয়সার পালা' নামে স্টেজে নামিয়ে দারুণ জমিয়ে ছিলেন এক সময়। অপুর সঙ্গে সেই নাটক দেখতে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিল রজত।

গানটা যতদূর মনে আছে এই রকম :

ইচ্ছে করলে হাঙরেরও দাঁত দেখতে পাবে
কিন্তু যখন মহিমবাবুর ছুরিটা চমকাবে
তুমি দেখতে পাবে না পাবে না ...

এই গানটা মনে পড়বার পর থেকেই মহিমের ওপর তার রাগ ক্রমশ বাড়ছে। একমুখী রাগ। অন্য কোনও কথাই আর তার মনে পড়ে না।

ডায়মন্ড হারবার রোডে সেই আম্রপালি রিসর্টের সামনে মহিম আর প্রভাতীকে নামতে দেখে রজতের হঠাৎ মনে হলো, এই মেয়েটা আমার। ওকে কেন ওই বদমাস লোকটা নিয়ে যাবে ?

কেন ওই মেয়েটিকে রজত আমার বলে ভাবলো ? পৃথিবীর অন্য কেউ সে যুক্তি বুঝবে না। শুধু রজতের কাছেই সেটা অকাট্য।

এই কুড়ি বছরে রজত সবচেয়ে বেশি কার কথা ভেবেছে ? বাবা কিংবা মায়ের কথা নয়, বর্ণা কিংবা ছেলেমেয়ের কথাও নয়। বিলেতে থাকার সময়েও সে রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় এবং সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তার মনে পড়তো নীলকণ্ঠ ঘোষালের মুখ। বিস্ফারিত চোখে তিনি বলছেন, বাবা, আমাকে মেরো না, মেরো না, আমি কী দোষ করেছি ?

বিপ্লব চেতনায় ব্যক্তি বিশেষের কোনও স্থান নেই। নীলকণ্ঠ ঘোষাল এই পচা গলা সমাজের ততোধিক দুর্গন্ধযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার একজন প্রতিনিধি মাত্র। একজন পুলিশ যেমন তার পারিবারিক জীবনে একজন স্নেহশীল পিতা, বা দায়িত্ববান স্বামী বা মাতৃভক্ত পুত্র— যা কিছু হতে পারে, সে হয়তো অসৎ নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে বিপ্লবকর্মীদের চোখে সে নিছক একজন পুলিশ, শাসক শ্রেণীর দরোয়ান অর্থাৎ শ্রেণীশত্রু। নীলকণ্ঠ ঘোষালও তাই এবং রজত নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা তো ঠিকই আছে। কিন্তু রজত কেন ওই মুখ, ওই আর্ত প্রশ্ন আর নিজের হাতের রক্তের কথা ভুলতে পারে না ? প্রতিদিন, এই কুড়ি বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন, ওই মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এখন খুব কাছের লোক হয়ে গেছেন। রজতের কাছে সবচেয়ে চেনা মুখ, যেন তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

এরপর নীলকণ্ঠ ঘোষালের পরিবারের বৃত্তান্ত জানার পর তার মনে হয়, এরাও তার আপনজন। নীলকণ্ঠ ঘোষালের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী

www.BanglaBook.org

জড়িয়ে গেছে রজত, প্রভাতী নামে এই মেয়েটির ওপর সবচেয়ে বেশি তারই অধিকার। সুকুমারের দোকানটি যদি উঠে যাবার উপক্রম হয়, রজতকে তো সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে, যেমন ভাবে নীলকণ্ঠ ঘোষাল গিয়ে দাঁড়াতেন। ও পাড়ার মাস্তানরা যদি মারতে আসে, রজতকেও সেই মার খেতে হবে সুকুমারের সঙ্গে সঙ্গে। এ ছাড়া তার উপায় নেই।

যে মুহূর্তে রজতের মনে হলো, প্রভাতীর ওপর তার অধিকার সবচেয়ে বেশি তখনই সে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়েছিল ওদের মাঝখানে। আচমকা তার হাতের একটা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়েছিল মহিম গুপ্ত। উঠে দাঁড়িয়ে প্রভাতীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, এ হারামিটা কে ? তুই চিনিস ?

প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রভাতী বলেছিল, না চিনি না। কখনো দেখিনি।

মহিম গুপ্ত তখন অন্য লোকদের ডাকতে ডাকতে হুংকার দিচ্ছিল, মার শালাকে, মার শালাকে !

ওইভাবে ছুটে যাওয়া এবং পরে দশ বারোটি লোকের বিরুদ্ধে এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে লড়ে যাবার চেষ্টা, অতি নির্বোধও এমন কাজ করে না। অত মার খেতে খেতেও তার বোধ ফেরেনি।

বর্ণার কাছে সত্যি কথাই বলেছিল রজত। ওই সময়টুকুর জন্য নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিল সে। পাগল না হলে কেউ অমন কাজ করে ?

॥ ৬ ॥

ছুটির দিনে বাড়িতে ছেলেমেয়েরা না থাকলে কি ছুটি উপভোগ করা যায় ? সকাল থেকে মনমরা ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না রজত। দু'খানা খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেছে, তবু পড়েই যাচ্ছে, আজেবাজে খবর, বিজ্ঞাপন। বসে আছে একই চেয়ারে। চেয়ার ছেড়ে উঠলেই সে কিছু না-কিছু ভাঙতে শুরু করবে। এর মধ্যে একটা চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

স্নেহ নিম্নগামী। কৈশোর বয়স থেকেই প্রায় রজত তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁদের স্নেহের মর্ম বোঝেনি। যে-ছেলে বড় বয়সেও মায়ের আঁচল ধরে থাকে আর বাবার যে-কোনও কথাকেই বেদবাক্যের মতন মনে করে, নিজস্ব

www.BanglaBook.org

মতামত গড়ে তোলে না, তার দ্বারা কিস্যু হয় না। রজত দূরে দূরে থেকেছে বলেই বাবা আর মায়ের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন টানও বজায় রাখতে পেরেছে। তার জীবনের পরিমণ্ডল থেকে বাবা-মাকে বাদ দেয়নি কখনও। কিন্তু রজতের মনের মধ্যে যে এতখানি বাৎসল্য জমে ছিল, তা সে নিজেই জানত না। সুবু আর জাম্পিকে সে কয়েক দিন দেখেনি, রীতিমতন কষ্ট হচ্ছে তার। বাড়িটা এত নিস্তরঙ্গ!

বর্ণা জানত, এটাই হবে রজতের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। এমনকি নিজের জেদ বিসর্জন দিয়ে রজত শুধু ছেলে-মেয়ের জন্যই এক দিন ছুটে যাবে মধ্যমগ্রামে।

ধরা যাক, বর্ণার সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়ে গেল, তারপর সুবু আর জাম্পি কার কাছে থাকবে? মামলা হবে। সুবু আর জাম্পি দু'জনেরই অনেক কিছু বোঝার মতন বয়স হয়েছে। ওরা জানবে বাবা আর মা পরস্পরের নামে খারাপ খারাপ কথা বলছে।

আইনের চোখে সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে মায়ের দাবিই বেশি। রজত তা মানবে না। দরকার হলে সে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে যাবে। তার ছেলেমেয়েদের সে বর্ণার দাদার আওতায় মানুষ হতে দেবে না কিছুতেই।

যখন সে সুবুকে আর জাম্পিকে খুব বেশি করে কাছে পেতে চেয়েছিল, তখনই বর্ণা ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল! ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পারলে সে হয়তো আর একবালপুরের মোড়ে যেত না!

হারু এক জন অতিথিকে নিয়ে এলো ওপরে। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। মাথায় একরাশ চুল, হাতে একটা ফাইল, কল্যাণ সেনগুপ্ত। প্রায়ই বিভিন্ন উপলক্ষে কল্যাণ চাঁদা চাইতে আসে, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, বন্দিমুক্তি, অনশনরত শ্রমিকদের সাহায্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গ্রামীণ দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য সাহায্য—এরকম কত কিছুর সঙ্গে যে কল্যাণ জড়িত তার ঠিক নেই। যত কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকুক, কল্যাণ এক জন আপন ভোলা মানুষ, সে একেবারেই স্বার্থচিন্তা করে না। সেই জন্যই রজত তর্ক না করে প্রত্যেকবারই কিছু না-কিছু চাঁদা দেয়।

আজ কিন্তু কল্যাণ কোনওরকম চাঁদার কথা উল্লেখই করলো না। ঢুকেই জিজ্ঞেস করলো, আজ ছুটি তো?

রজত বললো, হ্যাঁ। শনিবার আমাদের হাফ ডে, কিন্তু এবারে সোমবারও ছুটি বলে টানা তিন দিনই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। লং

www.BanglaBook.org

উইকএন্ড !

কল্যাণ বললো, আমি সেই ক্যালকুলেশানেই এসেছি। আমি নলহাটি যাচ্ছি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? আজকের রাতটা ওখানে থাকবো, কাল বিকেলে ফেরা। ইচ্ছে করলে সিউড়িও ঘুরে আসতে পারি তাহলে পরশু পর্যন্ত।

শুধু চাঁদা তোলা নয়, কল্যাণ নিজের কাঁধে আর একটা দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, ঘুরে ঘুরে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর রাখা, যে-সব বন্ধু আর বেঁচে নেই, তাদের বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করা। বিয়ে করেনি কল্যাণ, লাইফ ইনসিওরেন্সে সাধারণ চাকরি করে, ছুটি পেলেই বাইরে চলে যায়। এরই মধ্যে আবার উল্টোডাঙার খালের ধারে রাস্তার ছেলেদের নিয়ে ইস্কুল চালাচ্ছে একটা। এই সব নিয়ে ও বেশ মেতে আছে, সদা হাস্যময় মুখ।

কল্যাণ ঠিক কলেজের বন্ধু নয় রজতের, আন্দোলনের সময়ে ও ছিল অন্য ইউনিটে। এমনি পরিচয় ছিল, একবার পালিয়ে পালিয়ে ঘোরার সময় কল্যাণের সঙ্গে এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল একটানা ন' দিন। তখন অন্য এক জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে রজত আশ্রয় খুঁজছিল, সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না সাহায্য করার মতন, লাভপুর স্টেশনে কল্যাণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা।

রজত বললো, না হে, আমি তো আজ যেতে পারব না তোমার সঙ্গে।

কল্যাণ বললো, জরুরি কিছু কাজ আছে ? তা হলে থাক। বর্ণা কোথায় ?

রজত সতর্ক হয়ে গেল। কল্যাণের যা স্বভাব, যদি শোনে বা বুঝে যায় যে বর্ণার সঙ্গে তার গণ্ডগোল চলছে, তাহলে নলহাটি যাওয়া ভুলে গিয়ে এক্ষুনি মধ্যমগ্রামে ছুটবে বর্ণাকে বোঝাতে।

কপালে একটাও রেখা পড়তে না দিয়ে, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রজত বললো, বাপের বাড়ি গেছে, একটা বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার আছে। আমার আবার ওই সব নেমন্তন্নে যেতে ইচ্ছে করে না।

কল্যাণ বললো, বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নগুলো বড্ড ভাল্‌গার হয়। এত টাকার শ্রাদ্ধ ! কত খাবার নষ্ট হয়। পাঁচ-ছ' শো লোক ডেকে খাওয়ানো, এই টাকা অন্য কত কাজে লাগতে পারে। বিয়েবাড়ির এই নেমন্তন্ন বন্ধ করার জন্য একটা আন্দোলন করলে হয় না ?

রজত বললো, আর কত ব্যাপার নিয়ে তুমি আন্দোলন করবে, কল্যাণ ?

www.BanglaBook.org

কল্যাণ বললো, তোমার ওই ছেলেটি কফি তৈরি করে দিতে পারবে না ? বর্ণা খুব ভালো কফি বানায়, আসতে আসতে ভাবছিলাম, তোমার বাড়িতে ভালো কফি খাবো।

কল্যাণ মদ খায় না, সিগারেট খায় না। তার চা-কফির নেশা। দিনে কুড়ি বাইশ কাপেও আপত্তি নেই।

হারুকে ডেকে কফি বানাতে বললো রজত। কল্যাণ নিজে তার সঙ্গে জুড়ে দিল, 'চিঁড়ে ভাজা আর বাদাম আছে ? কফির সঙ্গে খুব ভাল জমে'।

রজত বললো, নলহাটি বড্ড দূর, কিসে যাবে ?

কল্যাণ বললো, ট্রেনে বোলপুর। সেখান থেকে অনেক বাস পাওয়া যাবে। রহমান সাহেবকে একবার দেখে আসবো। উনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

রজত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কল্যাণ এমনি এমনি তার কাছে আসেনি, অন্য কোনও জায়গায় গেলে অন্য কোনও বন্ধুকে সঙ্গী হবার প্রস্তাব দিত। নলহাটিতে এই রহমান সাহেবের বাড়িতেই আশ্রয় পেয়েছিল রজত। রহমান সাহেব অতটা আন্তরিকতা নিয়ে সাহায্য না করলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল সেবারেই।

সেই সত্তরের দশকের উত্তাল দিনগুলিতে, যখন কংগ্রেসী, সি পি এম এবং পুলিশ সবাই মিলে রজতের পার্টির ছেলেদের তাড়া করছে, ধরা পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই, সেই সময় যারা আশ্রয় দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল, তারা অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, প্রকৃত বন্ধু ছিল। এখন অনেকেই তাদের ভুলে গেছে। কল্যাণ ভোলেনি। কল্যাণ সেই বাড়িগুলিতে এখনও নিয়মিত যায়, তাদের আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছে।

রজতের অবশ্যই যাওয়া উচিত কল্যাণের সঙ্গে। মেঘলা মেঘলা দিন, গরমের কষ্ট নেই, দু'দিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালোই লাগত।

কিন্তু আজই সন্ধেবেলা বর্ণার দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন। বর্ণা নিশ্চিত সেখানে আসবে। রজত যাবে বলে কথা দিয়েছে। এখন যদি সে নলহাটিতে চলে যায়, তা হলে সবাই ধরে নেবে সে বর্ণার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, বর্ণার সঙ্গে ঝগড়া মেটাতে আগ্রহী নয়।

কল্যাণের একটা গুণ আছে, কেউ চাঁদা দিতে না চাইলে যেমন জোর করে না, তেমনই কেউ তার সঙ্গে যেতে রাজি না হলেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পীড়াপীড়ি করে না। সে একাই চলে যাবে।

এর পরে কল্যাণ না বুঝে, সচেতন না থেকে, রজতের বিবেকে সাংঘাতিক একটা খোঁচা দিল। সে আপন মনেই বললো, রহমান সাহেবের ক্যান্সার হয়েছে, আর বেশি দিন বাঁচবেন না, তাই শেষ দেখাটা করে আসি।

রজতের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। নলহাটিতে থাকার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল রজত, তখন নিজের হাতে রহমান সাহেব তার সেবা করেছিলেন। যে-ঘরটায় কল্যাণ আর রজত থাকত, সেখানে বাড়ির মেয়েরা কেউ আসত না, কাজের লোকদেরও কিছু জানানো হয়নি, রহমান সাহেব নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করতেন না, তাঁর বড় ছেলেটি ছিল অতি বদ। রহমান সাহেব নিজের হাতে ওদের জন্য খাবার এনে দিতেন, তিনি এক দিন রজতের বমি পরিষ্কার করেছিলেন।

মৃত্যুপথযাত্রী সেই রহমান সাহেবকে একবার শেষ দেখা দেখতে যাবে না রজত ? সে এত অকৃতজ্ঞ !

ইচ্ছে হলো একবার বলে, ঠিক আছে, কল্যাণ, চলো আমি যাবো তোমার সঙ্গে।

কিন্তু তার পরিণতি কী হবে ? সে এখন কলকাতা থেকে উধাও হয়ে গেলে আরও জট পাকিয়ে যাবে তার পারিবারিক জীবন, সেই জট কি আর খোলা যাবে ?

মুশকিল হচ্ছে যে, এই সব কথা খুলেও বলা যাচ্ছে না কল্যাণকে।

কল্যাণ অবশ্য এর মধ্যেই চলে গেছে অন্য প্রসঙ্গে। তার ফুটপাথের স্কুলের ছাত্রদের কথা বলতে বলতে সে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথা টেনে আনলো। সে বললো, জানো রজত, ওরা তো গরিবস্য গরিব, যাকে বলে হা-ভাতে। ছেলেমেয়ে, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-গান্ধীর নাম জানে না, ওদের কাছে মাও সে তুং-এর কথা বলা হাস্যকর। তবে ওরা কিন্তু ঠিক বোঝে, কাদের জন্য ওদের এই দারিদ্র্য, মারোয়াড়ির বাড়ির বিয়েতে কতগুলো মোটর গাড়ি আসে, ভোটের সময় কেন কম্বল আর টাকা পাওয়া যায়। দেশের অবস্থা একটু বোঝালেই ধরতে পারে। সেই তুলনায় দেখো, সচ্ছল পরিবারের যে-সব ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো ইস্কুলে পড়ে, তারা যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের কী তফাত তা জানে না। ঝিলিতি গান-বাজনা

www.BanglaBook.org

শোনে।

রজত চুপ করে রইলো। সে কী বলবে, তার নিজের ছেলেমেয়েই তো এরকম।

কল্যাণ বললো, ভবিষ্যৎ কি এরকমই চলবে? ছাত্রসমাজ আর সমাজ পাল্টাবার কথা ভাববে না?

রজত বললো, কোনও সম্ভাবনাই তো দেখছি না। সব কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে!

কল্যাণ সব সময় আশাবাদী। সে উজ্জ্বল মুখে বললো, তা বলে আঠেরো-উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেদের মনটা তো আর পাল্টে যায়নি! টাটকা, সতেজ প্রাণ, একটা আদর্শ যদি ওদের সামনে ধরা হয়, ওরা ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সে জন্য দরকার উপযুক্ত লিডারশিপ। আমাদের সময়ে এই ভুলটাই হয়েছিল। লিডারশিপই ছিল বিশৃঙ্খল। হাজার হাজার ডেডিকেটেড ছেলেমেয়ে নিয়ে কী বিরাট একটা শক্তি হতে পারত! আর্মি জেনারেলের মতন কেউ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করলো না। আমরা টুকরো-টুকরোভাবে ইচ্ছেমতন অ্যাকশান চালিয়েছিলাম।

রজত বললো, এখনই বা সে রকম লিডারশিপ কোথায়?

কল্যাণ বললো, তৈরি করতে হবে। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের আগেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে না ডেকে লিডারদের সব রকমভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তাদের নিজেদের জীবনের আদর্শে যেন কোনও রকম ত্রুটি না থাকে। আমাদের সময় লিডাররা বড় বড় গাল ভরা কথা, রক্ত চঞ্চল করা কথা বলেছে, কিন্তু ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এভরি অ্যাকশান হ্যাজ ইট্‌স ওইন রি-অ্যাকশান, সে চিন্তা করেনি। এবারে আর সে ভুল করলে চলবে না। আমি কী করে নকশাল পার্টিতে জয়েন করলাম, তোমাকে সে গল্প বলেছি?

—না।

—আমি তখন শিলিগুড়ি কলেজে পড়ি। নকশালবাড়ির কৃষকদের ওপর গুলি চালনার ঘটনা ঘটে গেছে কিছুদিন আগে। ছাত্রদের মধ্যে তাই নিয়ে খুব একটা সোরগোল চলছে, আমি তাতে যোগ দিইনি। আমাদের বাড়িতে পলিটিক্সের সঙ্গে কারুর কোনও যোগ ছিল না। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন উৎপল দত্ত এলেন ওখানকার ইউনিভার্সিটিতে। একটা জিপ নিয়ে ঘুরছিলেন, দেখেই চিনতে পেরেছি। সঙ্গে বোধ হয় তাপস সেন আর কে কে যেন ছিলেন। আমরা শুনলাম, নকশালবাড়ির ঘটনা নিয়ে উনি 'তীর'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে একটা নাটক লিখবেন, তাই সেই গুলি চালনার জায়গা, টুকুরিয়া ফরেস্ট নিজের চোখে দেখবার জন্য এসেছেন। তুমি দিলীপ বাগচিকে চেনো ?

—হ্যাঁ, চিনতাম এক সময়।

—সেই সময় আমাদের ওদিককার নাম করা ছাত্রনেতা। দিলীপদা উৎপল দত্তদের নিয়ে ঘুরছিলেন। দিলীপদাই তাড়াতাড়ি একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করে উৎপল দত্তকে দিয়ে একটা বক্তৃতা দেওয়ালেন। আমাদের মতন চুনোপুঁটিরা সেই মিটিং-এর জন্য স্টেজ বাঁধার কাজে হাত লাগিয়েছিলাম। উৎপল দত্তকে কাছ থেকে দেখতে পাবো, তাঁর কথা শুনবো, এই জন্য আমার দারুণ উৎসাহ। সেদিনের বক্তৃতায় উৎপল দত্ত কী বলেছিলেন জানো ? প্রতিটি শব্দে যেন বিদ্যুৎ। প্রতিটি বাক্যে আগুনে ঝাঁপ দেবার ডাক। মূল কথাটা তিনি বললেন, 'আমাদের সামনে দুটি বাড়ি আছে। নকশালবাড়ি আর বেশ্যাবাড়ি। এর মাঝে কোনও বাড়ি নেই, আছে গভীর নোংরা বোঝাই খাদ। আপনারা কোন্ বাড়িতে যাবেন সেটা বেছে নিতে হবে, মাঝামাঝি থাকার উপায় নেই।' তোমায় কী বলবো, রজত, শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, আমার অত প্রিয় এক জন মানুষের কাছ থেকে অমন কথা শুনে সেই মুহূর্তে আমি পথ ঠিক করে ফেললাম।

রজত হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললো, উনি শেষ পর্যন্ত কোন্ বাড়িতে গিয়েছিলেন ?

কল্যাণ বললো, দ্যাখো, ওঁরা আর্টিস্ট মানুষ, ওঁদের বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অমন তীব্র ভাষায় অমন একটা কথা উনি বলে গেলেন, আমাদের মতন অল্পবয়সী ছেলেদের মনে কী গভীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা চিন্তা করলেন না।

রজত বললেন, ওটাও তো ওঁর নাটক। স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনেতারা যে-সব নাটুকে ভাষা বলে, নিজেরা কি তা বিশ্বাস করে ?

কল্যাণ বললো, ওঁকে তো শুধু নাট্যকার বা অভিনেতা নয়, আমাদের এক জন তাত্ত্বিক নেতা বলেও মনে করতাম।

রজত জিজ্ঞেস করলো, একবার উনি বিদেশি একটা ফিল্মে অভিনয় করার জন্য জেল থেকে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সে খবর তুমি জানতে ? জেল থেকে যারা মুচলেকা দিয়ে বেরোয়, তারা বিপ্লবী নেতা হতে পারে ?

কল্যাণ বললো, ওসব পুরনো কথা আর আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই

www.BanglaBook.org

না। তোমাকে এই উদাহরণটা দিলাম, এক-এক জন নেতার কথায় অল্প বয়সীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বোঝাবার জন্য। উৎপল দত্তর ওই বক্তৃতা শুনেই আমি বাড়ি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আগুনে। এখন যারা নেতা হবে, তাদের এইরকম ফাঁকা বুলি দিলে চলবে না। খাঁটি নেতা না হলে কোনও বড় কাজ হয় না।

রজত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তুমি নেতা তৈরি করার কাজে লেগে থাকো ভাই কল্যাণ, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আমি বাতিল হয়ে গেছি!

কল্যাণ বললো, যাঃ, ওরকমভাবে কথা বলো না। বাতিল আবার কী? একটু আধটু নৈরাশ্য আসে মাঝে মাঝে, আবার কেটে যায়। সব যদি আমরা বাতিল করে দিই, তাহলে আমাদের যৌবনের সেই দিনগুলি, সেই তেজ, সেই কষ্ট স্বীকার, সেই তীব্র বিশ্বাস, এসবও যে ব্যর্থ হয়ে যায়। এরকম ব্যর্থতাবোধ নিয়ে বাকি জীবনটা আমরা কাটাবো কী করে?

রজত বললো, অনেকেই তো কাটাচ্ছে, দল পাল্টেছে, কিংবা যেমন-তেমনভাবে টাকা রোজগারের নেশায় মেতে আছে।

কল্যাণ দু হাত নাড়তে নাড়তে বললো, বাদ দাও, বাদ দাও, ওদের কথা বাদ দাও, তুমি, আমি, আমাদের মতন কয়েক জন ঠিক থাকলেই হলো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, ওরে বাপরে, ট্রেন ধরতে হবে, আর সময় নেই। হাওড়া ব্রিজের কাছে রোজ জ্যাম হচ্ছে।

রজত বললো, তুমি রহমান সাহেবকে বলো, আমি ভুলে যাইনি। আজ আমার বিশেষ একটা কাজ আছে, তাই যেতে পারলাম না।

কল্যাণ বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবো, দেখি, যদি ওঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসতে পারি, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়ই।

কল্যাণের সঙ্গে আজ নলহাটি যেতে পারলে কত ভালো হত। ফেরার পথে সিউড়িতে নেমে দেখে আসা যেত শশাঙ্ককে। শশাঙ্ক এখনও লিখে চলেছে? লেখাগুলো পড়ে দেখার দরকার ছিল।

কল্যাণ এসে আজ রহমান সাহেবের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল।

লাভপুর স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল রজত, বেশ জ্বর ছিল গায়ে, শরীরের সব গাঁটে গাঁটে ব্যথা। ট্রেন এলেই উঠে পড়বে, কিন্তু কোথায় যাবে তা জানে না। পলাতক জীবনের শেষ দিকে একেবারে অসহায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবস্থা। সঙ্গীসাথীদের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, এক এক জন ধরা পড়ছে বা খুন হচ্ছে। সেই সময় কল্যাণের সঙ্গে ওখানে দেখা।

কল্যাণ পুরুলিয়ায় জয়া মিত্রদের দলে কাজ করছিল। জয়া মিত্র পুরুলিয়া শহরে একটা স্কুলে পড়াতেন, তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি গোষ্ঠী। পুলিশের তাড়া খেয়ে সেই গোষ্ঠীটাও তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বেপরোয়া, ডাকাবুকো ধরনের ছেলে নয় কল্যাণ, বাইরেটা বরাবরই বেশ শান্ত, কিন্তু ভেতরের বিশ্বাসের জায়গাটা ইস্পাতের মতন।

দু-তিনবার বাস বদল করে কল্যাণ তাকে নিয়ে গিয়েছিল নলহাটি। তুললো একেবারে শত্রুপক্ষের গুহায়।

মিজানুর রহমান কংগ্রেসের নেতা হিসেবে নলহাটি এলাকায় বেশ পরিচিত। পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। কল্যাণের কাকার সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিলেন, এইটুকুই শুধু যোগসূত্র। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও জ্বরের ঘোরে প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রজত সে বাড়িতে পৌঁছোবার সময় কিছু বুঝতে পারেনি। বিকেল পাঁচটা থেকে টানা আঠেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল। পরদিন চোখ মেলে দেখে একটা চৌকিতে সে আর কল্যাণ শুয়ে আছে পাশাপাশি, ঠিক তার সামনের দেওয়ালে গান্ধীজি ও জওহরলালের দুটি ছবি।

সেই ছবি দেখে উৎকণ্ঠিত চোখে কল্যাণের দিকে তাকাতেই সে বলেছিল, কংগ্রেসের বাড়িই আমাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে পুলিশ আসবে না। ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না।

রজত বলেছিল, বাড়ির মালিক যদি ধরিয়ে দেয় ?

কল্যাণ বলেছিল, রহমান সাহেব কট্টর গান্ধীবাদী। উনি এমন কাজ করতেই পারেন না। ওঁকে দেখলেই তুই বুঝবি।

রহমান সাহেবকে সে দেখেছিল খানিক পরে। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি, ধুতি আর ফতুয়া পরা, চোখ দুটি ভারি স্নিগ্ধ। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের এই ঘরে কেউ আসবে না, তোমরাও সহসা বাহিরে যেও না। তোমাদের কেশের ডগা স্পর্শ করারও সাধ্য নাই পুলিশের। যত দিন ইচ্ছা হয় এখানে থাকবে। ব্যস্ততার কিছু নাই। পরে কোথাও যেতে চাইলে আমি নিজে তোমাদের পঁহুছে দিয়ে আসবো।

রজতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার জ্বরের ধরনটা ভালো নয় গো। যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস না থাকে, আমি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এনে দেব। তোমার কখনও ব্রঙ্কাইটিস

www.BanglaBook.org

হয়েছিল ?

রহমান সাহেবের সঙ্গে কয়েক দিন কথা বলার পর রজত ওঁর সঙ্গে নিজের বাবার মিল খুঁজে পেত। পরাধীন আমল থেকে রাজনীতি করছেন, রাজনীতির চেয়েও দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেমই ওঁদের কাছে বড়। বাবা যদিও কমিউনিজ্‌মের আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তবু দেশপ্রেম ব্যাপারটা ওঁর কথাবার্তায় ফুটে বেরুত। রহমান সাহেব গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, চল্লিশের দশকে মুসলিম লিগের আহ্বান, প্রলোভন বা হুমকিতেও আদর্শচ্যুত হননি, আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর, এম সি চাগলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন কথায় কথায়।

পরে রজত জেনেছিল, রহমান সাহেবের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। স্ত্রী বিগত হয়েছিলেন অনেক আগেই, সংসারে বড় ছেলেরই দাপট। সে ছেলের নাম বদরুদ্দিন চৌধুরী, তার চরিত্র বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে খানিকটা দাম্ভিক ও উদ্ধত ধরনের, এক মুখ দাড়ি ও মাথায় টুপি, কথার মধ্যে অনবরত উর্দু শব্দ মেশায়, তাঁর ধারণা খাঁটি বাংলা বললে খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। তত দিনে পাকিস্তান দু টুকরো হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, এদিককার অনেক মুসলমান বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি, বদরুদ্দিনও সেই দলে। তার ধারণা, ভারতের হিন্দু নেতারা, তথা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ মুসলমান শক্তিকে দুর্বল করে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানকে ভেঙেছে। বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদ সে মানে না।

বাড়িতে গান-বাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল বদরুদ্দিন শেখ। তার বাবা ধুতি পরেন বলে তাতে তার ঘোর আপত্তি। বাবাকে সে গ্রাহ্যই করে না। মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে সে একবার ইলেকশানেও দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সেই সত্তরের দশকের পশ্চিম বাংলায় আর যাই হোক কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তিরই মাথাচাড়া দেবার উপায় ছিল না, শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়েছিল বদরুদ্দিন, জামানত পর্যন্ত জব্দ হয়েছিল।

অমন বাবার এরকম ছেলে হয় কী করে ? রহমান সাহেবের সে জন্য আফসোসের অন্ত ছিল না। এক জেনারেশান এগিয়ে যায়, আবার পরবর্তী জেনারেশান পিছিয়ে যায়। রহমান সাহেবের উদার মানবিকতার এক টুকরোও পায়নি তাঁর ছেলে। অবশ্য রজতও তো তার বাবার মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়েছিল।

রহমান সাহেব তাঁর নিজের পার্টির নীতির বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের ছেলেরা সেই সময় টের পেলে তাঁর বিপদ হতে পারত, নিজের ছেলেকেও না জানিয়ে, তিনি দুটি পলাতক নকশাল যুবককে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন শুধু মানবিকতার কারণে। মানুষ, যে-কোনও দলেরই হোক, সে তো মানুষ, তার সঙ্গে মানুষেরই মতন ব্যবহার করা উচিত। এ ধরনের কথা আজকাল প্রায় কেউই মানে না। রজতদের বাঁচাবার জন্য রহমান সাহেব অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলের ভয়েই তিনি ওদের আর একটি জায়গায় পাঠিয়ে দেন।

একটা দিনের কথা বিশেষ করে মনে আছে রজতের। তখন জ্বরের ঘোরে রজত মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। একবার চোখ মেলে দেখল, ঘরে সে সম্পূর্ণ একা। কল্যাণ পাশে নেই। তখন একা থাকলেই তার ভয় করত। মনে হত, বন্ধুও বুঝি বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছে, পুলিশ ডেকে এনে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কল্যাণ তখন গিয়েছিল বাথরুমে। রজত ছটফট করে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কপালের ওপর টের পেল একটা ঠাণ্ডা হাত। শিয়রের পাশে একটা টুল নিয়ে বসে রহমান সাহেব তার কপালে জলপট্টি দিচ্ছেন আর একটা পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। ঠিক মায়ের মতন।

রজত আবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ার পর রহমান সাহেব মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, ইস, এই সব হীরের টুকরো ছেলে! বাবা, তোমারা কেন এই পথে যাচ্ছ আমি বুঝি না। মায়ের নাড়ি-ছেঁড়া ধন, না-জানি মাতা ঠাকুরানি কত না কষ্ট পাচ্ছেন। কত লেখাপড়া শিখেছ, কত যত্নের শরীর, এখন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, পুলিশ ধরতে পারলে কুকুরের মতন পিটায়ে মারবে। ইস!

রজত বলেছিল, কাকাবাবু, আপনি এবার শুতে যান। আমি এখন ভাল আছি।

রহমান সাহেব বলেছিলেন, যাব, আমার কোনও অসুবিধা নাই। আমি তো চিকিৎসা করি, রুগীর পাশে বসার অভ্যাস আছে। শোনো বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই। কিসের বিরুদ্ধে তোমাদের এত আক্রোশ, সেটাই তো আমি বুঝি না। তোমরা কমিউনিস্ট, তোমরা চাও সমাজতন্ত্র। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের নেহরুজিও তো ধনতন্ত্রের দিকে না ঝুঁকে সোভিয়েত

www.BanglaBook.org

ইউনিয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। মিশ্র সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেই অর্থনীতি গড়েছিলেন। কংগ্রেস এখনও সেই নীতি নিয়েই চলেছে। তা হলে তোমাদের আপত্তি কিসের ?

কথাটা শুনে রজতের হাসি পেয়েছিল, যদিও তখন তার হাসবার মতন অবস্থা নয়। রহমান সাহেব অতি সরল, তিনি বুঝি ভাবেন সব কমিউনিস্টই সমান ? অথবা মুখে যারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে তারাই কমিউনিস্ট ! সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ! সোভিয়েত ইউনিয়ান এখন এক নম্বর শোধনবাদী, চিন সমেত মুক্ত দুনিয়ার ক্ষতি করে যাচ্ছে। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুকাবিলা করার মুরোদ নেই—

এসব কথা বলেনি রজত, চুপ করে ছিল।

রহমান সাহেব আরও বলেছিলেন, তোমরা যা চাও, আমরাও তা চাই। সব মানুষ খেতে পরতে পাবে, রাষ্ট্রের কাছে সমান অধিকার পাবে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতী রাজ কায়েম হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে। আমরা ধীরে ধীরে চলেছি, তোমরা চাও তাড়াতাড়ি সব পাল্টায়ে দিতে। শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব। বাবা রজত, শ্রেণীসংগ্রাম কি সব দেশে এক রকম হতে পারে ? আমাদের এই ভারতবর্ষে কত রকম ধর্ম, কত জাত-পাতের বিভেদ, কত ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান-খাদ্যের কত প্রভেদ, এখানে তো শ্রেণী মাত্র দুইটা না, হাজারটা। তুমি হিন্দু হয়ে এক মুসলমান জোতদারকে মারতে যাও, অমনি দাঙ্গা বেঁধে যাবে, গরিব মুসলমানরাও তোমার কথা বুঝবে না। আগে সকলকে বুঝাতে হবে তো। হঠাৎ যদি বিপ্লব শুরু করে দাও, সারা দেশে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যাবে, হুড়োহুড়ি করে দেশভাগের ফলে যেমন হাজার হাজার পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, বিনা প্রস্তুতিতে বিপ্লব শুরু হলে সেই রকম কত মানুষ যে মরবে তার ইয়ত্তা নেই। তার পরেও যে সেই রক্ত-কাদার উপরে কোনও পবিত্র সমাজ গড়ে উঠবে, তারই বা গ্যারান্টি কোথায় ? ফরাসি বিপ্লব নষ্ট করে দিয়েছিল নেপোলিয়ান, কামাল আতাতুর্কের পর তুরস্কে আবার শুরু হয়েছিল হানাহানি, সোভিয়েত ইউনিয়ানে বিপ্লবের পর লেনিন সাহেব ঠিকমতন গড়ার সময়ই পেলেন না, তিনি যেই গেলেন অমনি শুরু হয়ে গেল ভ্রাতৃবিরোধ, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। স্টালিন সাহেব ক্ষমতা দখল করে আবার নিজের দেশেরই লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারলেন, সবার মুখ বন্ধ করে রাখলেন, কেউ একটু টুঁ শব্দে প্রতিবাদ করলেই সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, এখন তো শুনি সব মানুষ ভাল করে খেতেও

www.BanglaBook.org

পায় না, নেতারা খায় পেট পুরে, প্রজারা খায় এঁটোকাঁটা। এই কি পবিত্র সমাজ ?

জলপট্টি আবার ভিজিয়ে দিয়ে মুখটা কাছে এনে রহমান সাহেব বলেছিলেন, আমার কথা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, না ? বুড়া হয়েছি, একটু বেশি বকবক করি। আমার কথা অনেককেই তো বলতে যাই, কেউ বোঝে না। আমাদের পার্টির ছেলেরাও শোনে না। সবাই এখন ছটফট করে। আসল কথা কি জানো বাবা, মানুষ, ঠিকমতন মানুষ চাই। আদর্শ তো ঠিকই আছে, আদর্শে কোনও ভুল নাই, তোমার আদর্শ আর আমার আদর্শে কোনও বিরোধ নাই, যেটুকু মতান্তর, তা পথ নিয়ে। তা পথও আলাদা হোক। কিন্তু আদর্শের যারা নিয়ামক হবে, নতুন সমাজে যারা সুস্থ নীতির প্রতিষ্ঠা করবে, তারা নিজেরা যদি পরিচ্ছন্ন, সৎ, স্বার্থহীন, সমদর্শী না হয়, তা হলে সে দেশের কোনও উন্নতি হতে পারে না। ইন্ডিয়াতে এখন ক্ষমতা দখলের নোংরা লড়াই চলেছে। ক্ষমতা দখলের জন্য নেতারা কত রকম মিথ্যা কথাই যে বলে ! এক-এক জন নেতার এক-একটি ভুল সিদ্ধান্তে শত শত মানুষের প্রাণ যায়। দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, আমার বড় কষ্ট হয় !

অনেক দিন আগেকার কথা, তবু সব মনে আছে রজতের।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস দলের ক্রম-অবনতি দেখে নিশ্চয়ই আরও কষ্ট পেয়েছেন রহমান সাহেব। যে-রকম আদর্শ নেতার কথা তিনি কল্পনা করতেন, তাঁরা এখন বিলুপ্ত প্রজাতি। ওরকম আর হবেও না, সে যুগ কেটে গেছে। ক্ষমতা দখলের নামই তো রাজনীতি। যে-কোনও উপায়ে। সবাই বলেন, আগে তো ক্ষমতা হাতে পাই, তারপর দেশ গড়ব। তারপর একবার ক্ষমতা পেলে সেখানে টিকে থাকার চেষ্টাতেই অধিকাংশ সময় খরচ হয়ে যায়। আদর্শ-টাদর্শ ঘুচে গেছে, রাজনীতি এখন প্রফেশনাল ব্যাপার। কিছু লোক অল্প বয়স থেকেই ঠিক করে নেয়, নেতা হব, ভোটে দাঁড়াব, মন্ত্রী হব, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব। সততা, পরিচ্ছন্নতা এসব প্রশ্ন তোলার দরকার নেই, কর্মদক্ষতা থাকলেই যথেষ্ট। শুধু রাজনীতি কেন, জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও এখন কে কত সৎ !

কলকাতা থেকে নলহাটি যাতায়াত করা খুব সহজ নয়। অনেকবার রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছে রজত, যাওয়া হয়নি। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রহমান সাহেবের নাম খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখা যেত, কংগ্রেস মহলে ক্ষ্যাপাটে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্পষ্টবাদী বলে তাঁর একটা পরিচিতি ছিল, ইদানীং তিনি একেবারে চাপা পড়ে গেছেন। শরীর ভেঙে গেছে, চোখে ভাল দেখতে পেতেন না বলে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছিলেন, মনও ভেঙে গিয়েছিল। কল্যাণ বেশ কয়েকবার গেছে, তার কাছ থেকে রজত খবর পেয়েছে। বদরুদ্দিন তার বাবাকে বাড়ির এক কোণে ফেলে রেখেছে, কোনও যত্ন নেয় না। যে আলো-বাতাসহীন ছোট্ট ঘরটায় কল্যাণ আর রজত আশ্রয় নিয়েছিল, রহমান সাহেব এখন সেখানে থাকেন। ছেলের ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাবারও শক্তি নেই। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়।

কল্যাণ এমন কিছু উপার্জন করে না, তবু সে বলল, রহমান সাহেবকে কলকাতা এনে চিকিৎসা করাবার চেষ্টা করবে। কল্যাণের চেয়ে রজতের সামর্থ্য অনেক বেশি, তারই কি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল না? রজতের আবার ইচ্ছে হল, এখনও ছুটে বেরিয়ে গেলে হাওড়ায় সে কল্যাণকে ধরে ফেলতে পারবে।

কিন্তু বর্ণা, বর্ণার চেয়ে বেশি, আজ সন্ধেবেলা সুবু আর জাম্পির সঙ্গে দেখা হবে। সে কথা ভেবে কাল থেকে সে অধীর হয়ে আছে। আজ তার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভবই না।

কল্যাণ বিয়ে-টিয়ে করেনি, আপন খেয়ালে বেশ আছে, মুক্ত পুরুষ। কল্যাণ কী করে বুঝবে, বিবাহিত জীবনযাপন করা কত শক্ত, কত শক্ত!

॥ ৭ ॥

সন্ধেবেলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রায় সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে রজত, এমন সময় ওপর থেকে হারু বলল, দাদাবাবু, আপনার টেলিফোন!

পেছন ফিরে রজত বলল, কে জিজ্ঞেস কর।

হারু বলল, দ্বিজেন বাগচি, এম এল এ, আপনার সঙ্গে চেনা আছে বললেন। আর বললেন যে, খুব জরুরি দরকার।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল রজত। তারপর বলল, বলে দে, আমি এইমাত্র বেরিয়ে গেছি।

চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেছে রজতের। এই দ্বিজেনটাই তো যত নষ্টের গোড়া। সেদিন সেই আম্রপালির সামনের ঘটনাটার পর দৈবাৎ দ্বিজেন থানায় উপস্থিত ছিল। বেশ ভাল কথা। পার্টিগত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শত্রুতা ছাড়া দ্বিজেনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ঝগড়া হয়নি কখনও। পুরনো বন্ধুকে দেখে সে ব্যাপারটা নিজে নিজে মিটিয়ে ফেলতে পারত না ? বর্ণার দাদা ঐ সত্যব্রত মজুমদারকেই বলতে গেল কেন ? ওকে না জানালে ঘটনাটা আর কেউ জানতেই পারত না। সত্যব্রতই বর্ণার কাছে সাতকাহন করে লাগিয়েছে।

দ্বিজেন ভেবেছিল, যারা রজতকে মেরেছে তাদের মধ্যে সি পি এমের কিছু ছেলেও আছে। ওরা তো এখন সব জায়গায়, গুণ্ডা-বদমাশ-সাট্টাবাজদের মধ্যেও। পুরনো বদ্‌লা নেবার জন্য নকশালদের ওপর এরকম চোরাগোপ্তা আক্রমণ এখনও চলে। কিন্তু দ্বিজেনের পার্টি ইদানীং আর এসব ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় না। খুচরো মারামারি এড়িয়ে চলার নীতি নিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে। সেইজন্য দ্বিজেন তাড়াতাড়ি এক জন কংগ্রেসি এম এল এ-কে জড়িয়ে নিয়ে, ব্যাপারটাকে একটা সেক্স স্ক্যান্ডালের রূপ দিয়ে, ধামাচাপা দেবার উদারতা দেখাল। রাজনৈতিক কোনও ব্যাপার নয়, এর মধ্যে সি পি এম নেই, চমৎকার বুদ্ধি।

আজ আবার সে টেলিফোন করছে কেন ? রজতের কোনও ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে কথা বলার।

একতলার ঘরের দরজার পাশ থেকে শান্তিপিসি বললেন, পিছু ডাক পড়ল, একটু বসে যা খোকা।

এসব মেয়েলি সংস্কার। মা একেবারেই মানেন না। শান্তিপিসির এই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপারকে এখন সহাস্যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

রজতের মনে পড়ল, তার 'মা, বেরোচ্ছি'ও বলা হয়নি। ফিরে এসে দেখল, আজ আর ক্যারাম বোর্ড পাতা নেই, একটা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে বসে আছেন মা, মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে, দৃষ্টি সুদূর। কোলের ওপর একটা খোলা বই।

চোখের ইঙ্গিতে সে শান্তিপিসিকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ?

শান্তিপিসি বললেন, কী জানি, আজ সন্ধে থেকে তোর মা একটাও কথা বলছেন না।

জুতো বাইরে খুলে, কাছে এসে রজত জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার কী হয়েছে ?

মা কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি এখানে নেই।

রজত ভুরু কুঁচকে সকালে পড়া খবরের কাগজের কথা ভাবল। যথারীতি আজও কিছু খুনোখুনির খবর আছে বটে, মণিপুরে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, কিন্তু বড় কোনও ম্যাসাকারের ঘটনা নেই।

www.BanglaBook.org

রজত মায়ের কাঁধে হাত রাখল।

মায়ের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা জল।

রজত প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমাকে কিছু বলবে না, মা? মা!

মা মুখ না ফিরিয়ে, একটা হাত তুলে রজতের হাত ধরলেন। রজত দেখল, মায়ের কোলে একটা বাংলা বই, 'শহীদের মা'। এ বই রজতও পড়েছে, মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য।

মা আপ্লুত স্বরে বললেন, সন্ধে থেকে একটা কথাই ভাবছি, এক জন মা, তার দুটি জোয়ান ছেলেকেই মেরে ফেলেছে, তবু সে কী করে বাঁচে? উঃ কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে! খোকা, তোর বন্ধুদের মধ্যে কেউ এরকম খুনোখুনির মধ্যে ছিল? ভাবলেই আমার এত ভয় করে!

রজত সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, মা, তোমাকে তো বলেছি, আমাদের গ্রুপ চারু মজুমদারের লাইন মেনে নেয়নি। তুমি যে বইটা পড়ছ, সেটাতেই তো ফুটে উঠেছে, আমাদের দলের ছেলেরা বেশি মার খেয়েছে। সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের ছেলেদের মারছিল।

মা বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু নকশালরাও তো আগে খুনোখুনি শুরু করেছিল। তারা বুঝি শিলিগুড়ির দল? খোকা, তুই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলি, ভগবানের দয়ায় আবার ফিরেও এসেছিস, যদি না ফিরতিস, যদি তোকে মেরে ফেলত, তা হলে আমি এখন কী করতাম রে? কী করতাম, খোকা? বল, কী করতাম? তাই যখন আমি অন্য মায়েদের কথা ভাবি—

মায়ের চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, চুপ করে রইল রজত।

মা বললেন, অনেক ইতিহাস পড়েছি, রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ, এক রাজ্যের সৈন্যরা আর এক রাজ্য দখল করে লুটপাট করেছে, হাজার হাজার মানুষকে মেরেছে, আবার দেশের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ইতিহাসের পাতায় পাতায় শুধু রক্ত...কিন্তু এই যে ব্যাপার, যুদ্ধ ঘোষণা নেই, বিপ্লব শুরু হয়নি, প্রায় একই ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েরা কিছু একটা বিশ্বাসের গোঁড়ামি নিয়ে, কিংবা নেতাদের ভুল নির্দেশে পরস্পরকে ছুরি মারছে, তুচ্ছ কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অমূল্য প্রাণ, এসব কোনও ইতিহাসে লেখা থাকে না। পুলিশের গুলি খেয়ে মরল অপু, কত ভাল ছেলে, কেন সে চলে গেল, কোথাও লেখা থাকবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু থেমে মা আবার আপন মনে বলতে লাগলেন :

হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে
হত্যা বিহগের নীড়ে, কীটের গহ্বরে
অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে...

রজত আস্তে আস্তে সরে এলো সেখান থেকে।

মায়ের সামনে মিথ্যে কথা বলা যায়, কিন্তু সেই মিথ্যে-মাখানো মুখ নিয়ে বেশিক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

সে জানে, মায়ের আজ এই ভাব চলবে অনেকক্ষণ। এর আগেও এ রকম কয়েকবার হয়েছে। এর আগেও মা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন, রজতের বন্ধুদের কেউ প্রত্যক্ষ খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না। সরাসরি মা রজতকে এই প্রশ্ন করেননি কখনও। নিজের ছেলে সম্পর্কে কোনও মা-ই বোধ হয় ও কথাটা ভাবতে পারে না।

হ্যাঁ, মিথ্যে তো বলতেই হবে। পৃথিবীর কোনও খুনিই কি তার মায়ের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে? রজত জানে, অন্য কেউ এসে বললে মা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

মোটর সাইকেলটা বার করে স্টার্ট দিল রজত। এই শব্দটা তাকে চাঙ্গা করে তোলে। মাথায় হেলমেট পরে, হাত দুটো দু দিকে ছড়িয়ে মোটর সাইকেল চালাবার সময় যেন ব্যক্তিত্ব বদলে যায়। এই সময়কার চেহারাটাও যেন ঠিক ভারতীয় নয়। সেই তুলনায় স্কুটার, বা অন্যান্য টু-হুইলার অনেক নিরীহ।

সুপর্ণা-সুরঞ্জনদের বাড়ির কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল রজত। হঠাৎ যেন তার যাওয়ার ইচ্ছেটা কমে যাচ্ছে।

মোটর সাইকেলটা এক জায়গায় থামিয়ে সে ভাবতে লাগল। বর্ণার দিদিদের বাড়িতে এর আগে এসে সে কতবার আড্ডা মেরেছে। ওরা দুজনেই বেশ মজা-প্রবণ, হইচই-পছন্দ মানুষ। ওদের সন্তান নেই, আর হবেও না মনে হয়। প্রায়ই ওরা দত্তক নেবার কথা ভাবে। মাদার টেরিজার আশ্রমে ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু মাদারের একটি শর্ত আছে, ছেলে কিংবা মেয়ে, এই নিয়ে বাছাবাছি চলবে না, শিশুটিকে আগে দেখাও যাবে না। সিরিয়াল অনুযায়ী যে শিশুটি আসবে, তাকেই নিতে হবে। এতেই সুপর্ণার আপত্তি, যদি বস্তির ঝি কিংবা বেশ্যার মেয়েকে দিয়ে দেয়, যদি সে কানা-খোঁড়া হয়, এই

www.BanglaBook.org

দুর্ভাবনায় আর নেওয়াই হল না। সুরঞ্জনের নিজস্ব ব্যবসা আছে, প্রায়ই বাড়িতে লোকজনদের নেমন্তন্ন করে সে অনেক টাকা খরচ করে।

সেদিন অফিসে সুরঞ্জনকে দেখে রজত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কেন ? সে কি বর্ণাকে আর ফিরে পেতে চায় না ? না, তা তো নয়, সে বর্ণাকে চায়, সুবু আর জাম্পিকে চায়, সে পারিবারিক জীবন টিকিয়ে রাখতেই চায়। এটাই তার বাঁচার একমাত্র পথ।

তবু আজ রজতের মনে হচ্ছে, সুপর্ণাদের বাড়িটা যেন শত্রুপক্ষের আস্তানা। কাকে কাকে নেমন্তন্ন করেছে কে জানে। ওরা সবাই এক দলে। সবাই মিলে রজতকে ঘিরে ধরে আঙুল তুলে প্রশ্ন করবে, কেন, কেন, সেই রাতে তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন ?

আজ ওদের ওখানে না গেলে কী হয় ? বাড়ি ফিরে রজত টেলিফোন করে দিতে পারে যে তার শরীর ভাল নেই। হঠাৎ জ্বর হতেই পারে। কলকাতার নানা দিকে এখন জ্বরজারি হচ্ছে।

রজত আবার স্টার্ট দিল। হুস করে সামনের দিকে এগিয়ে, বাঁক নিল টিভি স্টেশনের পাশ দিয়ে। সে যাবে না কেন ? কারুকে সে গ্রাহ্য করে না। সবাই মিলে অভিযোগ শুরু করলে, সে সোজাসুজি বলে দেবে, আমি উত্তর দিতে রাজি নই !

ধরা যাক, বর্ণার সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়েই গেল। তার পরেও কি সুপর্ণা সুরঞ্জনদের সঙ্গে রজতের কোনও সম্পর্ক থাকবে ? সেদিন পর্যন্ত সুপর্ণা তার সঙ্গে খানিকটা প্রেম-প্রেম ভাব নিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছে, তখন কি রাস্তায় দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে ! সুরঞ্জন অনেকবার বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কেনার সময় রজতের পরামর্শ নিয়েছে, বর্ণার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলেই সে রজতের সঙ্গে আর কথা বলবে না ? এসব ক্ষেত্রে কী হয়, রজত জানে না।

দোতলায় ফ্ল্যাট, বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে কণ্ঠস্বর। এক হাতে হেলমেটটা ধরে রেখে রজত বেল টিপল। দরজা খুলল সুপর্ণা, সালোয়ার-কামিজ পরায় তাকে অনেক কমবয়সী দেখাচ্ছে, ঈষৎ নেশাও হয়েছে তার, বক্রহাসি দিয়ে বলল, অ্যাই, এত দেরি করলে যে !

সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি, অন্তত ডজনখানেক নারী পুরুষ, সাধারণত যা হয়, মেয়েরা এক দিকে, পুরুষরা এক দিকে। বাইরের বারান্দার কাছে পাঁচ-ছ' জন পুরুষ এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে, তাদের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, এই রজত, এদিকে এসো,

www.BanglaBook.org

এদিকে এসো, চেয়ার রেখেছি তোমার জন্য।

সুপর্ণা রজতের হাত ধরে সে পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

রজত প্রথমেই দেখে নিল, সত্যব্রত মজুমদার সেখানে নেই। সুরঞ্জনের দুজন বন্ধু, রজত তাদের চেনে, এক জন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক, তাকেও এ বাড়িতে রজত দু-একবার দেখেছে, সুরঞ্জনের মামাতো ভাই বিশ্বজিৎ, এককালে সেও নকশাল ছিল, এখন বুর্জোয়া খবরের কাগজে সাংবাদিক, শুধু আর একজন রজতের অচেনা। বিশ্বজিৎই রজতকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলল, আমাদের মধ্যে একটা তর্ক হয়েছে, দু দিক প্রায় সমান সমান, তোমার মতামতটা দাও। নরসিম্‌হা রাও আর অর্জুন সিং, এই দু'জনের মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে কে বেটার হতে পারে ?

রজত বলল, পচা কাঁঠাল আর পচা আম, এই দুয়ের মধ্যে কে বেটার আমি জানি না !

ওরা একটা আড্ডার মধ্যে ছিল, তার মধ্যে জুড়ে যেতে রজতের দেরি হল না। সুরঞ্জন তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা মদের গেলাস। আড্ডায় অনবরত প্রসঙ্গ বদলায়, মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য, এসব আসরে কেউ রাগারাগি করে না।

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কেটে গেল, কেউ রজতের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটা কথাও বলল না। যেন কিছুই ঘটেনি, আগে যে-রকম এই বাড়ির অনেক পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে রজত, সেই রকমই আজ এসেছে। সুরঞ্জন-সুপর্ণা কি সবাইকে আগে থেকে শিখিয়ে রেখেছে যে, কেউ ওই প্রসঙ্গ তুলবে না ?

ও পাশের মেয়েদের মধ্যে বর্ণাকে প্রথমে দেখতে পায়নি রজত। একটু পরে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বর্ণা, একটা হালকা নীল ঢাকাই শাড়ি পড়েছে, গলায় একটা মুক্তোর মালা। আসল, না নকল মুক্তো তা রজত জানে না, বর্ণার গয়নার খবর সে রাখে না। বেশ দেখাচ্ছে বর্ণাকে। অন্য মেয়েরা কয়েক জন বেশি সাজগোজ করেছে, দুটি মহিলা বর্ণার চেয়েও রূপসী, তবু নিজের স্ত্রীকে দেখে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করল রজত। বর্ণার সঙ্গে তো তার ঝগড়া হয়নি, কোনও কারণে বর্ণার প্রতি বিতৃষ্ণাও জন্মায়নি, রাগ করেছে তো বর্ণা একা।

এখন তার দৃষ্টি নরম, মুখের থেকে নেই রাগের আঁচ, সে বসল না, দাঁড়িয়ে রইল একটি চেয়ার ধরে। কয়েকবার চোখাচোখিও হল রজতের সঙ্গে। কেউই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু গেলাস বিলিতি হুইস্কি পান করে খানিকটা চনমনে হবার পর রজতের মনে হল, বর্ণা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু আড়ষ্টতা কাটাতে পারছে না। এরকম একটা অবস্থায় পুরুষেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত। মধ্যমগ্রামে না গিয়ে, কোনও খবর না নিয়ে রজত তার জেদ বজায় রেখেছে, এখন বর্ণার কাছে সে মাথা নোয়াতে পারে। তাতে বর্ণারও রাগ বা অভিমান মূল্য পাবে।

বর্ণার হাতের গেলাসে কমলালেবু রঙের পানীয়। ওর মধ্যে ভোদকা মেশানো থাকতে পারে। বর্ণা এরকম পছন্দ করে। ওর কখনও নেশা হয় না, অবশ্য দু গেলাসের বেশি খায়ও না। সুপর্ণা বরং নেশা করতে ভালবাসে। এখনই ওর হাঁটার মধ্যে নাচের ছন্দ এসেছে। সুপর্ণা হাসছে খুব জোরে জোরে।

বিশ্বজিতের স্ত্রী অমিয়া কী যেন এক লম্বা গল্প বলে যাচ্ছে বর্ণাকে, বর্ণা মাথা নেড়ে যাচ্ছে শুধু। এর মধ্যে গিয়ে রজত কথা বলতে পারে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অধীর হয়ে যাচ্ছে সে। ইচ্ছে করছে বর্ণাকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে, সবার সামনে।

এদিকে বিশ্বজিৎ খুব আড্ডা জমিয়ে দিয়েছে। রজতের মনে আছে, কৃষ্ণনগর কলেজের সামনে এই বিশ্বজিৎ একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্রের নামে অসীম ঘৃণা প্রকাশ করে এক বাণ্ডিল কাগজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এখন সে সেই পত্রিকাতেই চাকরি করে, সে এক জন 'নিরপেক্ষ' সাংবাদিক। সুযোগ পেলেই তুলোধোনা করে বামফ্রন্ট সরকারকে, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধেও গরম গরম কথা লেখে, শুধু জনা দুয়েক বাঙালি মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে। নিশ্চয়ই তার কোনও গূঢ় কারণ আছে।

বিশ্বজিৎ চূড়ান্ত ফতোয়া দিতে ভালবাসত। বিপ্লবীদের পক্ষে এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত না। সমসাময়িক প্রায় সমস্ত বাঙালি লেখকদের নাম ধরে ধরে বলত, এদের লেখা একেবারেই পড়া উচিত নয়, এদের লেখা বই বা পত্রপত্রিকা দেখলেই ছিঁড়ে ফেলতে হবে, এরা সবাই প্রতিক্রিয়াশীল। অপু বরং তখন অন্যরকম মত প্রকাশ করেছিল, অপু বলেছিল, দ্যাখ, একধার থেকে সবাইকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দূরে ঠেলে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। খবরের কাগজে, রেডিওতে, সরকারি অফিসে আমাদের আদর্শের প্রতি মোটামুটি বিশ্বাসী বা সহানুভূতিশীল ব্যক্তি আছে কি না, তা খুঁজে দেখা দরকার। বিপ্লবের সময় এদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহলেও আমরা পেনিট্রেট করতে পারি,

www.BanglaBook.org

তাঁদের বোঝাতে পারি....। কিন্তু তখন সবাই উগ্র হাওয়ার পন্থী, অপুর আবেদনে কেউ কান দেয়নি। খুনোখুনির আগের স্তরে, ভেঙে ফেল, পুড়িয়ে ফেল, গুঁড়িয়ে দাও এই সব কথাগুলোই উত্তেজনা জোগাত। তখন নিজেরা ছাড়া আর সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, সবাই সি আই এ-র এজেন্ট !

যেসব লেখকের নামে বিশ্বজিৎ সেই সময় বিষোদ্‌গার করত, এখন তাঁদের সঙ্গেই ওর ওঠা-বসা। বিশ্বজিৎ কী করে এমনভাবে মানিয়ে নিতে পারল ! পেরেছে বলেই বেশ আনন্দে আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক জন শিল্পী যখন উপস্থিত, তখন গান তো হবেই। ম্যাজিশিয়ান আর গায়ক-গায়িকা, এদের কোথাও নিস্তার নেই। গানের প্রস্তুতির জন্য একটা হারমোনিয়াম কার্পেটের মাঝখানে এনে সবাই যখন গুছিয়ে বসছে, সেই সুযোগে রজত উঠে গেল বর্ণার কাছে।

প্রথম কী কথা বলবে তা সে আগে থেকে ঠিক করেনি। বর্ণার কাছে গিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের তরঙ্গে বিরাগ বা তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা আছে কি না টের পাওয়া যায়। রজত সে রকম কিছু অনুভব করল না। সে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ছেলেমেয়েকে আনোনি ?

বর্ণা বলল, না। এখানে আর কোনও ছোট ছেলেমেয়ে নেই, তা ছাড়া সুবুর একটা ক্লাস টেস্ট আছে মঙ্গলবার।

রজত আবার বলল, ওদের স্কুল কবে থেকে ছুটি হবে ?

বর্ণা বলল, এই তো সামনের বুধবার হয়েই

—তুমি আজ মধ্যমগ্রামে ফিরবে ? কে নিয়ে যাবে ?

—এত রাতে আর ফিরব না। দিদির এখানে থাকব বলে এসেছি।

কথা থামিয়ে রজত বর্ণার দিকে চেয়ে রইল। বর্ণাও বেশ কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রাখার পর নত করল মুখ।

রজত বুঝল, এমন নিছক কেজো, সাদামাটা কথা এত দিন পর প্রথম কথা হতে পারে না। অন্য কিছু বলা উচিত ছিল। সে রকম কিছু খুঁজে না পেয়ে রজত বলল, এখানে থাকার চেয়ে...তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পার। মোটর সাইকেলটা এনেছি।

বর্ণা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানাল না, রেগে উঠল না, কিছু বললই না। চোখ তুলে আবার দেখল রজতকে। তার সেই দৃষ্টিতে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ।

www.BanglaBook.org

রজত এবার আকূতি জানিয়ে বলল, চল, বর্ণা, আমার সঙ্গে চল।

মুখ ফিরিয়ে রজত দেখল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা ওদের দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। রজতের হঠাৎ ইচ্ছে হল, সুপর্ণার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানাতে। এত সহজে, এত স্বাভাবিকভাবে সব মিটে গেল। কোনও নাটক করতে হল না, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

খাওয়াদাওয়ার শেষে, অন্য সব অতিথিরা বিদায় নেবার পর সুরঞ্জন বলল, এসো রজত, এবার নিরিবিলিতে বসে একটু লিকিয়র খাওয়া যাক। তোমার তাড়া নেই তো ?

সুরঞ্জন ভেবেছে, এবার আলোচনা শুরু হবে। সে বর্ণার সঙ্গে রজতকে কথা বলতে দেখেনি।

রজত বলল, না, আর বসব না। আমি বর্ণাকে নিয়ে যাচ্ছি।

দারুণ অবাক হয়ে সুরঞ্জন হাঁ করে চেয়ে রইল।

সুপর্ণা সারা মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বলল, না, তুমি কেন ওকে নিয়ে যাবে ? ও আমার এখানে থাকবে বলে এসেছে !

রজত বলল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

সুপর্ণা বলল, ওসব আমি জানি না। তা হলে তুমিও থাকো এখানে। আমরা তোমাদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি কিন্তু আড়ি পাতব !

রজত বলল, আর এক দিন এসে থাকব, আজ না।

সুপর্ণা বলল, তা হলে তুমি যাও, আমার বোনকে আমি ছাড়ব না। এত দিন খোঁজ নাওনি, অমনি আজ এসে নিয়ে যাব বললেই হল ?

সুরঞ্জন বলল, তুমি ছাড়তে চাও, না চাও, মনে হচ্ছে ও জোর করেই বউকে নিয়ে যাবে। সুভদ্রা হরণ ! তা হলে সেলিব্রেট করা যাক, নাও, সবাই একটু লিকিয়র খাও !

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এটা পঞ্চম। এর মধ্যে এক দিনও পাঁচটার বেশি খাইনি।

বর্ণা বলল, সত্যি ? আজ অবশ্য এতক্ষণ তোমাকে একটাও খেতে দেখিনি।

রজত বলল, লোকজনের মাঝখানে একটাও খাই না। তা হলেই বেড়ে যায়।

—মা কেমন আছেন ?

—ভাল। হ্যাঁ, একই রকম আছেন। হারু মাঝখানে দিন তিনেক ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সকালে কে তোমাকে চা করে দিত ?

—নিচে গিয়ে মায়ের ঘরে চা খেতাম। সুবু, জাম্পির জ্বরটর হয়নি তো ? চতুর্দিকে ক্যালকাটা ফিভার হচ্ছে। শান্তিপিসিও ভুগলেন।

—না। ওদের কিছু হয়নি। মধ্যমগ্রামে ওই জ্বরটা যায়নি।

নিজের হেলমেটটা বর্ণার মাথায় পরিয়ে দিল রজত। এত রাত্তিরে লাগে না, তবু।

এ যেন ঠিক বিয়ের পরে পরের দিনগুলোর মতন। সুবু, জাম্পি জন্মায়নি, রজত বউকে নিয়ে মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়াত অনেক রাত পর্যন্ত। একবার শ্রীরামপুর থেকে ফিরেছিল রাত বারোটার পর। একটা গাড়ি তাড়া করেছিল ওদের।

মেয়েরা মোটর সাইকেল চালায় না, কিন্তু ভালবাসে। বর্ণা খুবই পছন্দ করত। এই আওয়াজ, এত গতি। প্রত্যেকবার বাড়ির বাইরে যাওয়া মানেই যেন একটা অভিযান।

তখন বর্ণা দু' হাত দিয়ে রজতের কোমর জড়িয়ে ধরত। এখন আলতোভাবে ঘাড়ের কাছে হাত রেখেছে। বর্নার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছে রজত।

সে বলল, এবারের পুজোর ছুটিতে পুরী গেলে কেমন হয় ? সুবুর খুব সমুদ্র দেখার শখ। আমরা সেই একবার দীঘা গিয়েছিলাম, ওর বোধ হয় সে কথা মনেই নেই।

বর্ণা বলল, ওর তখন তিন বছর বয়স। মনে থাকবে কী করে ?

—স্টেট ব্যাঙ্কের একটা গেস্ট হাউস আছে পুরীতে, সেটা বুক করতে পারি। গোপালপুরেও যাওয়া যেতে পারে, তোমার কোন্‌টা পছন্দ !

—আমার পুরীই ভাল লাগে। তবে লক্ষ্মীপুজোর আগে ফিরতে হবে। দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন আছে।

—আলমারির লকারের চাবি তুমি কোথায় রেখেছ, আমি খুঁজে পাইনি।

—সেটা আছে বিছানার পাশের দেরাজে একটা চুরুটের বাক্সের মধ্যে। ওখানেই তো থাকে।

—তোমার নামে দুটো চিঠি এসেছে, খুলিনি। এক জন মহিলা ফোন করেছিলেন, নাম বললেন, প্রথমা।

—প্রথমা ! ফোন নাম্বার দিয়েছে ? আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত, অনেক দিন ওর খবর জানি না।

রজতের কাছে সদর দরজার চাবি থাকে। মায়েদের ঘর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকার। হারু শুয়ে থাকে সিঁড়ির নিচের একটা ঘরে। পা টিপে টিপে ওরা উঠে এল দোতলায়।

বড় ঘরটা খুলে রজত সুইচ টিপে সব কটা আলো জ্বেলে দিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু হাত ছড়িয়ে বলল, এই দ্যাখো তোমার সংসার, সব ঠিকঠাক আছে। আমি একটা জিনিসও সরাইনি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঈষৎ দ্বিধান্বিতভাবে জুতো খুলছে বর্ণা। মুখে একটু লজ্জার ভাব। যেন সে একটা নতুন বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এই ক'দিনেই একটু যেন রোগা হয়েছে সে, তবু শরীরের গড়নটি চমৎকার, হঠাৎ দেখলে কেউ বুঝবেই না যে, সে দুটি সন্তানের জননী, নিতম্বের তুলনায় কোমর বেশ সরু, দেখা যাচ্ছে তার ঝকঝকে মসৃণ পেট।

রজত আর পারল না, ছুটে গিয়ে দু' হাতে বুকে টেনে নিল তাকে, ঠোঁটে ঠোঁট। এ চুম্বন অন্তহীন, যেন সৃষ্টির আদি থেকে শুরু হয়েছে, শেষের পরেও থামবে না। কোনও কথা নেই, রজতের জিভ মুখের গরমের মধ্যে বর্ণার জিভকে অফার জানাচ্ছে, ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

রজতের দুই উরু সেঁটে আছে বর্ণার দুই উরুতে, তার এক হাত বর্ণার কোমরে, অন্য হাত বুকে, সে বর্ণার ব্লাউজের বোতাম খোলার চেষ্টা করছে।

রজতের তুলনায় বর্ণার হালকা-পলকা শরীর, যেন একটা পাখির মতন তাকে আলিঙ্গনের মধ্যে রেখেই রজত মাটি থেকে তুলে নিল, পাশের শয়নকক্ষে এনে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল।

এবার ঠোঁট খুলে রজত বলল, আমি আর পারছিলাম না, বর্ণা, কেন তুমি অত দিন ওখানে রইলে ?

বর্ণা বলল, আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল গো।

রজত বলল, তুমি জানো না, তুমি না থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। সারা দিনে তোমাকে একবার জড়িয়ে না ধরলে—

কথা বলতে বলতে সে বর্ণার আঁচল সরিয়ে ফেলেছে, ব্লাউজ খুলে ফেলেছে। পদ্মফুলের মতন স্তনে রজত মুখ রাখল। না, সে ঘ্রাণ নিচ্ছে না, শিশুর মতন ছটফট করছে।

আদরের তীব্রতায় রজতের চোখে জল এসে যাচ্ছে। বর্ণারও ছলছল করছে চোখ। সে হাত বুলোচ্ছে রজতের চুলে। রজতের মুখের লালায় ভিজে যাচ্ছে তার বুক। এই রজত তার নিজস্ব, শুধু তার একার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রজত বর্ণার শায়ার দড়িতে হাত দিতেই সে বলল, দাঁড়াও, একটু আসছি।

শাড়িটা ছেড়ে পাশের চেয়ারে রেখে, শুধু শায়া পড়ে, নগ্ন বুকে বর্ণা গেল ওয়ার্ড রোবের কাছে। কিছু পোশাক বার করে নিয়ে চলে গেল বাথরুমে।

বিয়ের পর প্রথম বছর, আর বারো বছর পরের অবস্থায় এই তফাত। তখন দামি শাড়ির ভাঁজ নষ্ট হল কি ছিঁড়ে গেল, এসব কথা চরম সময়ে মনেই পড়ত না। বিছানারও দরকার হত না, শুধু মেঝেতে শুয়েও মিলন হতে পারত।

এখন ঢাকাই শাড়ি নষ্ট করা চলে না। বাইরের পোশাক বদলে, নাইটি পরে না নিলে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না বর্ণা। তা ছাড়া আগে সে কিছু প্রসাধন সেরে নেয়।

রজতও খুলে ফেলল নিজের জামা ও প্যান্ট, সেগুলো ফেলে দিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে, কিন্তু বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পাজামা পরায় ইচ্ছে হল না। শুধু জাঙ্গিয়া পরে রইল।

বড় বেশি দেরি করছে বর্ণা। রজত আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। টনটন করছে তার পুরুষাঙ্গ। সে ওপরে তুলে রইল দু' হাত, যেন শূন্যতার মধ্যেও আলিঙ্গন করে আছে বর্ণাকে।

প্রায় দশ মিনিট বাদে, একটা আঁকাবাঁকা নীল-সাদা সাইকিডেলিক ধরনের রঙের রাত্রিবাস পরে, ক্রিম ও পাউডারের গন্ধ সারা শরীরে ছড়িয়ে বেরিয়ে এল বর্ণা। রজতের উত্থিত দু' হাতের মাঝখানের শূন্যতা ভরাট করে দিল সে। এখন তার অগ্রণী ভূমিকা। রজতের বুকের ওপর শুয়ে সে একটা গাঢ় চুম্বন দিল। রজত এক হাত ঢুকিয়ে দিল তার রাত-পোশাকের ভেতরে।

চুম্বনটি দীর্ঘস্থায়ী হল না।

মুখ তুলে বর্ণা খুব নরম গলায় বলল, হ্যাঁ গো, মেয়েটাকে তুমি সত্যি আগে চিনতে না ?

রজতের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, থেমে গেল হাত।

বর্ণা বলল, আমি কিছু মনে করব না। যা হবার হয়ে গেছে। মেয়েটাকে তুমি আগে কোথায় দেখেছিলে ?

রজত বর্ণার নিম্ন শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। বড় বড় দুটো নিশ্বাস ফেলল।

বর্ণা খানিকটা অনুনয়ের সুরে বলল, দিদিরা বারবার ওই এক কথা বলছিল, আমি বলেছি, তোমরা ওকে চেনো না, ও একটা মেয়েকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচাতে গিয়েছিল। ...তুমি শুধু আমাকে বলো... অত দূরে তুমি গিয়েছিলে... মেয়েটা তোমার কোনও বন্ধুর বোন ?

তড়াক করে খাট থেকে নেমে রজত প্যান্টটা পরে নিতে লাগল, খুব দ্রুত।

সরল বিস্ময়ে বর্ণা জিজ্ঞেস করল, কী হল ?

রজত বলল, আমি একটা হোটেলে চলে যাচ্ছি। তুমি থাকো এখানে।

বর্ণা বলল, আমি তো ঝগড়া করতে চাইনি। শুধু একবার জানতে চেয়েছি।

রজত বলল, আমি কারুকে কৈফিয়ত দিতে রাজি নই। কেউ যেন আমাকে ওই প্রশ্ন আর না করে। আই অ্যাম সিক অ্যান্ড টায়ার্ড অফ ইট। আমি বলব না, আর কিছু বলব না। এর আগে আমি অন্তত এক শো বার তোমার কাছে ক্ষমা চাইনি ? টেক ইট, অর লিভ ইট !

বর্ণা খানিকটা থতমত খেয়ে বলল, তুমি এত রেগে যাবে আমি বুঝিনি। এমনিই একটা কৌতূহল থাকতে পারে না ?

রজত রাগ চাপা দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এই সময়েই সে কথা বলতে হবে ?

বর্ণা বলল, ঠিক আছে, আমার ভুল হয়েছে। আমি স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছে। এসো। এসো—

তাড়াহুড়োতে জামা পরতে গিয়ে জামার হাতাটা উল্টে ফেলেছে রজত। সেটা ঠিক করতে করতে সে বর্ণার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। মনে হল, বর্ণা নয়, একটা ঠাণ্ডা রক্তমাংসের স্তূপ, প্রাণ নেই, ওকে আর ছুঁতেও ইচ্ছে করছে না রজতের।

সে বলল, থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

এবার হাঁটু গেড়ে বসে খানিকটা দর্পের সঙ্গে বর্ণা বলল, আমাদের মধ্যে কোনও বিশ্বাসের ব্যাপার থাকবে না, শুধু সেক্স করে যাবো ! আমি সেই জন্য আছি ? আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই ?

রজত বলল, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না !

বর্ণা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, তুমি কি চাও, আমি আবার চলে যাই ? এক্ষুনি চলে যেতে পারি।

এবারে বর্ণার কাছে এসে বীভৎস মুখভঙ্গি করে চাপা গর্জনের স্বরে রজত বলল, আমি তা বলিনি ! তুমিই এখানে থাকবে, আমি চলে যাবো। এই সব জিনিসপত্র, হ্যানো ত্যানো, এসব তোমার। তুমি এই সংসারে রাজত্ব করো, আমার সঙ্গে তোমাকে সেক্স করতে হবে না,

www.BanglaBook.org

আমি চলে যাচ্ছি অন্য জায়গায়।

রজতের ভেতরের জন্তুটা ছটফট করছে, লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মেয়েদের গায়ে হাত তোলার ব্যাপারটা রজতের ধ্যান-ধারণার মধ্যেই নেই। বর্ণার বদলে এখানে যদি কোনও পুরুষ থাকত, রজত তাকে সাঙ্ঘাতিক একটা আঘাত করত।

এবারে দু হাতে মুখ চাপা দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল বর্ণা।

কী করুণ, অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। যে মেয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, স্বামীর ওপর রাগ করে তার বাপের বাড়ি বেশি দিন থাকাটা মানায় না। তার মধ্যে একটা অপমানবোধ আছে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয়। ফিরে আসার জন্য সে নিজেই ছটফট করছিল। দিদির বাড়িতে দেখা হওয়ার পর সে রজতের সঙ্গে একটুও তিক্ত সুরে কথা বলেনি। রজত তার একমাত্র আশ্রয়। তবু মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে সব সময়, সেটা সে চেপে রাখবে কী করে? হয়তো সময়টা তার ভুল হয়েছে। সব কিছু হয়ে যাবার পর পাশাপাশি শুয়ে থেকে ধীরে সুস্থে সে প্রসঙ্গটা তুলতে পারত। সে সময় পুরুষ মানুষের মন প্রসন্ন থাকে। কিন্তু বাথরুমে যাওয়ার পরই যে কথাটা আবার তার মনে পড়ে গেল, তাই সে বলে ফেলেছে। বাথরুমে না যাওয়াই উচিত ছিল, দুটো শরীরই যখন উত্তপ্ত ছিল, তখন সেই উত্তাপ ব্যর্থ হতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

মানুষ যখন কাঁদে, তখন সেই কান্নার মধ্যে একটা আবেদন থাকে, কারুর কাছ থেকে সহানুভূতি চায়। কিন্তু এখন বর্ণার মনে হচ্ছে, আমার কেউ নেই। আমার কেউ নেই। সেই জন্য তার কান্না আরও বেশি করুণ শোনাচ্ছে।

কিন্তু এই দৃশ্য রজতকে স্পর্শ করল না। তার ভেতরের জন্তুটা বলছে, বেরিয়ে যাও রজত, লাফিয়ে মোটর বাইকে চাপো, তারপর ছোটো, ছোটো—

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রজত, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও থমকে গেল। এত রাতে বেরিয়ে গেলে আর তার নিষ্কৃতি নেই। জন্তুটাকে শেষ মুহূর্তে শেকল পরিয়ে সে উঠে গেল ছাদে।

সরু, লম্বা, মায়ের এককালের গোসাখর। ভেতরে ঢুকে সশব্দে খিল বন্ধ করে দিল রজত। আলো জ্বালালো না। খাট নেই, বিছানা নেই, ছেঁড়া বইপত্র, ভাঙা-চোরা জিনিস চতুর্দিকে ছড়ানো। টিকটিকি, আরসোলা, পোকামাকড় গিসগিস করছে, কিছুই গ্রাহ্য করল না রজত,

www.BanglaBook.org

তার মধ্যেই শুয়ে পড়ল। ঘুম আসবার কোনও প্রশ্নই নেই।

আস্তে আস্তে তার মনে পড়ল, ধরা পড়ার আগে মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে ঠিক এই রকম একটা ঘরে লুকিয়েছিল রজত। দরজা-জানলা সব বন্ধ থাকত, দিনের বেলাতেও সে ঘরে এ রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন রজত একা। সে ঘরখানা একটা গুদাম, ডাঁই করা ছিল আলুর বস্তা, আর কিচকিচ শব্দ করে ঘুরে বেড়াত ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর, রজতের গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে যেত। অত খারাপ ঘরে রজত আর কখনও থাকেনি। জেলের ঘর অত খারাপ ছিল না, জেলে তাকে আলাদা সেলে রাখা হয়নি, অনেকে মিলে থাকত একটা লম্বা হলঘরে।

মুর্শিদাবাদের সেই ঘরখানায় ইঁদুর-আরসোলার অত্যাচার সে গ্রাহ্যই করেনি, তবু সব সময় বুক ধকধক করত ভয়ে। সে গ্রামে পুলিশ একবার তল্লাসি করে গেছে। আবার এসে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে। বহরমপুরে যাবার চেষ্টা করে রজত ভুল করে ফেলেছিল। তার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। রজত বুঝতে পেরেছিল, সময় ঘনিয়ে এসেছে তার, ধরা সে পড়বেই। পুলিশ এসে প্রথমেই গুলি করবে, না মারতে মারতে গাড়িতে তুলবে, এই অনিশ্চয়তায় সে কাঁপছিল। কথা বলার কেউ নেই। এ রকম অবস্থায় মনোবল কী করে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, তাকে কেউ বলে দেয়নি। পুলিশ এসে যদি প্রথমেই গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়... এই চিন্তাটা তাড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত রজত একটা উপায় বার করেছিল। জীবনে সেই প্রথম রজত হস্তমৈথুন শুরু করে। মাটিতে গড়াতে-গড়াতে আঃ আঃ করে চাপা আর্তরব করতে করতে নিজেকে খুব ভালবাসতো রজত।

প্যান্টের ফাস্‌নার খুলে রজত চেপে ধরল নিজের কঠিন পুরুষাঙ্গ।

॥ ৮ ॥

একবার খুন করলে বিবেকের জড়তা কেটে যায়। আরও দু-চারটে খুন তো করা যেতেই পারে। লন্ডনে একা একা থাকার সময়ে এক-এক দিন রজতের মাথায় আগুন জ্বলে উঠত, অসহ্য রাগে মনে হত, এক্ষুনি দেশে ফিরে গিয়ে অন্তত দুজন লোককে খুন করতে।

পরমজিতের দাদার একটা হোটেল আছে বেলসাইজ পার্কে, সেখানে প্রথম আশ্রয় পেয়েছিল রজত। প্রথমে টেবিল পরিষ্কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তারপর ইংরিজি উচ্চারণ কিছুটা সড়গড় হবার পর স্টিউয়ার্ডের পদে উন্নীত হয়। দিনের বেলা পড়াশুনো, সন্ধের পর থেকে ডিউটি। হোটেলের কাজ অবশ্য তার বেশি দিন পছন্দ হয়নি, মান-সম্মানের প্রশ্ন নয়, কোনও কাজই যে ছোট নয় তা রজত জানত। কিন্তু হোটেলের রেস্তোরাঁয় অনেক ভারতীয়র সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, চেনাশুনো কেউ কেউ এসে পড়ে।

রজত কারুর সঙ্গে মিশতে চাইত না। সে তখন তার মনের একটা বিরাট দগদগে ক্ষতস্থান সারাচ্ছে। সেখানে কোনও সঙ্গী থাকতে পারে না। তা ছাড়া সব সময় তার মনে হত, বিপ্লবী আদর্শে পলাতকের কোনও স্থান নেই, অথচ সে স্বার্থপরের মতন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, তার অনেক বন্ধু—যাদের বিদেশে আসার সামর্থ্য নেই, তারা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে রয়ে গেছে দেশে। এই অপরাধবোধ রজতকে কিছুতেই ছাড়ে না।

এইটাই তো রজতের মুশকিল। তার মতন আরও বেশ কিছু ছেলে ছড়িয়ে পড়েছে ইংল্যান্ড, ক্যানাডা, জার্মানিতে, ভিসার প্রশ্ন নেই এই দেশগুলোয়, টিকিট কাটতে পারলেই হল। তাদের মধ্যে সামান্য দু-চারজনই শুধু রজতের মতন, বাকিরা আর অপরাধবোধ আর গ্লানিতে ভোগে না। এখানকার জীবন স্রোতে গা-ঢেলে দিয়েছে, পাবে যায় নিয়মিত, অল্পতেই মাতাল হয়, ট্রাফালগার স্কোয়ারে গিয়ে হই-হল্লা করে, বান্ধবীও জুটে গেছে কারুর কারুর। খুনও তো রজত একলা করেনি, আরও অনেকের হাতে রক্ত লেগেছিল, তারা এখন শুধু হাত নয়, মনটাকেও ধুয়ে ফেলেছে। তারা খুন করেছিল অন্ধের মতন। যেন একটা অলীক দুঃস্বপ্ন, এখন মুছে গেছে সব, তাই আবার স্বাভাবিক যৌবনবন্ত জীবন যাপন করতে তাদের কোনও দ্বিধা নেই। অন্তত সেই রকমই তো দেখে মনে হয়। রজতের মতন আর গুমরে গুমরে মরছে কে ?

হোটেলের কাজ ছেড়ে রজত একটা বড় লাইব্রেরিতে চাকরি জুটিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই সে ওদেশে মন বসাতে পারেনি। রজত যে কারুর সঙ্গে মেশে না, সেটাই ছিল অনেকের আছে আলোচ্য বিষয়। মেলামেশার বিপদও ছিল। এক দিন পিকাডেলি সার্কাসে দু দল বাঙালি ছাত্রের মধ্যে তুমুল মারামারি হয়ে গেল, কলকাতার রাজনৈতিক দলাদলি সক্রিয় ছিল ওদেশেও। রজতের লাইব্রেরিতে কাজ করত ওমর আর বেলাল নাম দুটি বাংলাদেশী ছাত্র। তাদের সঙ্গে পশ্চিম লন্ডনের বাংলাদেশীদের আড্ডায় তাকে যেতেই হয়েছে

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝে। সেখানেও দেখেছে ওদের মধ্যে আওয়ামি লিগের পক্ষে বিপক্ষে তীব্র মতবিরোধ এক এক সময় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিদেশেও বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য হয় না।

অনেকেই থেকে গেল ওদেশে। রজত ডিগ্রিটা হাতে পাবার পরই টিকিট কেটেছিল। বারবার সে প্রতিজ্ঞা করেছে, দেশে ফিরে দুজনকে চরম শাস্তি দিতেই হবে। না হলে তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ধরা পড়ার পর পুলিশ যে অত্যাচার করবে তা তো জানতই রজতরা। সেইজন্য তারা আগে থেকেই কিছু প্রস্তুতি নিয়েছিল। নিজেরাই কথা বলতে বলতে আঙুলের নখের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিত আলপিন। বন্ধুদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ ছিল, এক জন আর এক জনের গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে, কিন্তু উঃ করে উঠলে চলবে না, চোখের পাতা কাঁপবে না। এসব পরীক্ষায় পাস করা ছিল রজত। ধরা পড়ার পর জেরার সময় রজত প্রচুর অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু বিপুল জোয়ারদার নামে এক জন এস. আই ছিল এক নম্বরের পারভার্ট। রজতের হাত দুটো বেঁধে রেখে সে রজতের পুরুষাঙ্গ খপ করে আঁকড়ে ধরে চাপ দিত অনবরত। অপমানে, ঘেন্নায় কুঁকড়ে যেত রজত। লোকটার মুখে থুথু দিয়েছে কয়েকবার, তার বদলে আরও মার খেয়েছে, দস্তানার মধ্যে বালি ভরে পেটাত ঘাড়ে, তলপেটে, সে সবও সহ্য করা যায়। কিন্তু ওই জোয়ারদার প্রত্যেকবার রজতের ওই জায়গাটা চেপে ধরে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হাসত। রজত এক দিন বলেছিল, শুয়ারের বাচ্চা, তোমাকে আমি দেখে নেব। যদি বেঁচে থাকি, তোমাকে আমি শেষ করে দেব!

পুলিশের মধ্যে এ রকম কয়েক জন থাকে, যারা শুধু খবর বার করার জন্য অত্যাচার করে না, তারা তাদের বিকৃত উল্লাস মেটায়। ইলা মিত্র, অর্চনা গুহ এ রকম অনেকের ওপর নারকীয় অত্যাচারের কাহিনী রজত শুনেছে। কিন্তু দেশে ফেরার পর রজত ওই বিপুল জোয়ারদারের কোনও হদিশই পায়নি। পুলিশের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছে, সে পশ্চিম বাংলা ছেড়ে চলে গেছে অন্য রাজ্যে। শুধু তো রজত নয়, আরও অনেকের প্রতিশোধস্পৃহা ছিল ওই লোকটার ওপর।

দ্বিতীয় জনের নাম বাসুদেব। সে এক সময় রজতদেরই দলে ছিল, হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে দল পাল্টে ফেলে। তা পাল্টাক। অন্য দলের ছেলেদের সঙ্গে সামনা-সামনি অনেকবার মারামারি হয়েছে। বোমা ছোঁড়াছুড়ি নিয়ে। কিন্তু সেসব আদর্শের জন্য ফাইট। ওই

www.BanglaBook.org

বাসুদেবটা ছিল একটা ছুঁচো, তলে তলে পুলিশের ইনফরমার। অপুকে সে-ই ধরিয়ে দিয়েছিল। অনেকের কাছ থেকেই সে কথা জেনেছে রজত। অপু চলে যাওয়ায় রজতের আত্মার একটা অংশও যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। আত্মা বলে কিছু নেই। কথার কথা হিসেবে আমরা বলি। ধরা যাক চেতনা, রজত বুঝতে পারে, অপু নেই বলেই তার চেতনা এখন কত দুর্বল। অপুর মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ নয়, ওই বাসুদেব। তার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

কিন্তু বাসুদেবের ওপরও প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়নি রজত। লন্ডন থেকে ফেরার পরেই রজত শুনেছিল, গুমো হাবড়ার কাছে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছিল বাসুদেবের ছিন্নভিন্ন দেহ। আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা তা প্রমাণিত হয়নি। রজতের দৃঢ় ধারণা, তাদেরই কোনও বন্ধু বদলা নিয়েছে। বাসুদেবের মতন নপুংসকরা আত্মহত্যা করে না।

এই কুড়ি বছরে একবারও অস্ত্র ধরেনি রজত।

তবু আর এক জনকে খুন করার ইচ্ছে তার মনে উঁকি দেয়। সে নামটা মনে পড়া মাত্র রজত নিজেই শিউরে ওঠে। ধমকায় নিজেকে। শশাঙ্ক তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বৃত্তেরই এক জন ছিল। সেরকম সাঙ্ঘাতিক কিছু বিশ্বাসঘাতকতা সে করেনি। অনেক অত্যাচার সহ্য করেও সে রাজসাক্ষী হয়নি। আধপাগলা অবস্থায় বেঁচে আছে শশাঙ্ক। তার প্রতি মায়া হয় রজতের। সিউড়িতে তাকে দেখতে গেছে কয়েকবার। রজতকে দেখলে সে খুশি হয়। সব সময় চিনতে পারে না, অপু কিংবা অন্য কেউ বলে ভুল করে। উল্টোপাল্টা গল্প বলে, নিজে যে-সব অ্যাকশানে যায়নি, সেগুলোতেও নিজের একটা ভূমিকা কল্পনা করে নেয়। নাম গুলিয়ে ফেলুক বা যা-ই করুক, রজতকে কাছে পেয়ে শশাঙ্ক যে খুব খুশি হয়, তা বোঝা যায় ওর মুখচোখ দেখে। তবু শশাঙ্কর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক-এক সময় রজতের হঠাৎ মনে হয়েছে, ওর গলা টিপে মেরে ফেললে ক্ষতি কী? শশাঙ্কর আর এই রকম পাগল অবস্থায় বেঁচে থাকার কী দরকার? এ জীবনের আর কোনও মূল্য আছে? শশাঙ্ক লেখে, অনবরত লিখে যায়, কী লেখে তাও? যদি কখনও ওর বোধ ফিরে আসে, যদি হাওড়ার সেই ইস্কুল-মাস্টার হত্যার কাহিনী লিখে ফেলে? শশাঙ্ক কিছুটা জানত, আর কেউ সে ঘটনার সাক্ষী নেই, একমাত্র শশাঙ্কই রজতের নাম উল্লেখ করতে পারে।

না, শশাঙ্ককে কোনও দিনই মারতে পারবে না রজত। শশাঙ্ক লিখলেই বা কী আসে যায়, সবাই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে

www.BanglaBook.org

দেবে। তবু মারতে ইচ্ছে হয়েছে কয়েকবার। সত্যি সত্যি কারুকে খুন করা, আর কারুকে খুন করার প্রবল ইচ্ছে, এই দুটোর মধ্যে কত তফাত!

নাম নেই, মুখ নেই, এমন কারুকে খুন করার জন্য এখনও রজতের হাত নিশপিশ করে মাঝে মাঝে। অফিসে বসে সে কাজ করছে, দুরূহ সব হিসেব, সবাই দেখে ভাববে কী গভীরভাবে মনোযোগী রজত। কিন্তু ওরই মধ্যে তার ভেতরের জন্তুটা ফিসফিস করে বলে, আর এক জন কারুকে মারো না, রজত। দেখলে তো, একবার খুন করে কত সহজে পার পেয়ে গেলে, কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি, কেউ কিছু জানে না। আর এক জনকে মারো, মেরে এসে হাত ধুয়ে ফেলো, তাতে তোমার পৌরুষ আরও দীপ্তি পাবে। আবার তুমি অফিসে নিজের টেবিলে বসে কাজ করবে, কেউ কিছু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না।

বর্ণার সঙ্গে আর ঝগড়া হয়নি। বরং এক অদ্ভুত ধরনের সন্ধি হয়েছে।

সেই রাতের পর সকালবেলা বর্ণা এসে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল ছাদের ঘরের। তার হাতে চায়ের ট্রে। রজতের জামা-প্যান্ট ধুলোয় মাখামাখি, ঘুম এসেছিল শেষ রাতে, তখনও ঘুম বাকি ছিল। কিন্তু দরজা খুলে, বর্ণাকে চা আনতে দেখে সে ফিরিয়ে দেয়নি।

দুটো কাপ, একটা বড় পট ভর্তি চা। ঘরের মধ্যে না ঢুকে, বাইরের সিঁড়িতে বসে বর্ণা কাপে চা ঢালতে ঢালতে ম্লান গলায় বলেছিল, আমি রাত্তিরবেলা অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইছি। একটা কথা বলব? মধ্যমগ্রামে থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমাকে এখানে আর কিছুদিন অন্তত থাকতে দেবে?

রজত বলেছিল, কে তোমাকে মধ্যমগ্রামে যেতে বলেছে? আমি বলেছি কখনও? কাল রাত্তিরে আমি কী বলেছি, বুঝতে পারোনি? তুমিই এখানে থাকবে, আমি চলে যাব। আমি নিজের ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

মাটির দিকে তাকিয়ে, মাটিকে সম্বোধন করে বর্ণা বলেছিল, তুমি কেন নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে? তোমার মা রয়েছেন। সব কিছুই তোমাদের। আমি একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে... আমি জানি। বুঝে গেছি, তুমি আমাকে আর চাও না। আমাকে আর তোমার ভালো লাগে না।

রজতের শরীর চিড়বিড় করে উঠেছিল। সম্পূর্ণ উল্টো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিযোগ। সে বর্ণাকে চায় না ? গত রাতে সে বর্ণাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, বর্ণার পায়ে সে মাথা খুঁড়তেও রাজি ছিল, বর্ণা নিজেই তার সেই উদ্দীপনায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়নি ? আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে চাই, এ কথাটা কি চেঁচিয়ে বলবার মতন ? স্পর্শ বা চোখের ভাষায় বোঝা যায় না ? যখন স্পর্শে আর তেমন করে কিছু বাজে না, চোখের ভাষায় কিছু পড়া যায় না, তখন বুঝতে হবে সত্যিই প্রেম চলে গেছে।

এত কিছু না বলে রজত ঝাঁঝালো স্বরে বলল, তুমি বুঝে গেছ !

—আমি এতগুলো দিন মধ্যমগ্রামে, তুমি একবারও খবর নাওনি, আমার জন্য না হোক, ছেলেমেয়েদের জন্যও, টাকাপয়সা কিছু নিয়ে যাইনি, ওদের স্কুলে যাওয়া-আসার খরচ আছে...

—যাবার দিন সকালেও তুমি আমাকে কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিলে ? আমার মাকেও ঠিকমতন বলে যাওনি। তুমি ভালো করেই জানতে, মধ্যমগ্রামে যাওয়া-আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার বাবা যত দিন ছিলেন, যাইনি ? তোমার দাদার বাড়িতে আমি কখনও যাবো না। টাকাপয়সা নিয়ে যাওনি কেন ? ওসব ব্যাপারে আমি কোনও দিন কোনও কথা বলেছি ? তোমার যেমন খুশি খরচ করেছ, ক'দিন আগেও একটা ডিনার সেট কিনেছ অকারণে...তোমার ঠাণ্ডা ব্যবহার দেখে মনে হয়, আমার প্রতিই তোমার টান কমে গেছে।

—টান মানে কী ? এক বিছানায় শোওয়া ? বাইরের অন্য মেয়েদের সঙ্গে যা খুশি তাই করে আসবে, তবু আমি দাসী-বাঁদির মতন তুমি হুকুম করলেই—

—শাট আপ ! বাজে কথা বলবে না !

—তুমি আমাকে আগে কখনও এমন বিশ্রীভাবে ধমকাওনি। এতেই বোঝা যায়—

—তুমিও আগে আমার সম্পর্কে এ রকম কুৎসিত, বাজে কথা বলনি। আমি বাইরের মেয়েদের সঙ্গে কোনও দিন কিছু করিনি। এই ধরনের কথাও আমি কখনও শুনতে চাই না।

—তবে তুমি সত্যি কথাটা বলবে না কেন ? আমার কাছে সব খুলে বলবে না কেন ?

—যা বলার অনেকবার বলেছি। আর কিছু বলার নেই !

বর্ণা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। ঘুম থেকে উঠে চুলও আঁচড়ায়নি। পাতলা রাত্রিবাসের ওপর একটা শাড়ি জড়িয়ে পরে এসেছে। চোখ দুটিতে অনেক অশ্রু ক্ষরণের চিহ্ন। বড় পলকা,

www.BanglaBook.org

অসহায় তার বসে থাকার ভঙ্গি।

নিতান্ত দুর্বলেরও একটা দর্প থাকে। এক-এক সময় সাপের ফণার মতন ঝলসে ওঠে তেজ। হঠাৎ মাথা উঁচু করে তীব্র গলায় সে বলল, তুমি আমাকে ফেলনা ভেবো না। আমারও মানসম্মান আছে। ওই মেয়েটার কাছে তুমি কেন গিয়েছিলে, যত দিন না বলবে, তত দিন আমি তোমায় সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না। আমার ঘেন্না করবে। এতে তুমি আমায় বকো, মারো, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, যা খুশি করতে পারো। চেষ্টা করলে আমি একটা চাকরি পেয়ে যাবই, তখন একটা ফ্ল্যাট দেখে নিয়ে চলে যাব, তোমার ওপর বোঝা হয়ে থাকব না।

বর্ণার এই তীব্রতার ওপরে আর গলা চড়াতে পারেনি রজত। সে গম্ভীরভাবে বলেছিল, তাড়িয়ে দেওয়া, বেরিয়ে যেতে বলা, এ রকম কুরুচিকর ভাষা আমি কখনও ব্যবহার করি না, চিন্তাও করি না। তোমার ইচ্ছে হলে থাকবে, ইচ্ছে হলে চলে যাবে, তাই তো করেছ এত দিন। আমার সঙ্গে তোমাকে আর শুতে হবে না। দয়া করে ওই কথাটা আর শুনিও না আমাকে।

তারপর থেকে বর্ণা আর কোনও কথাই বলে না।

এক বাড়িতে, এক ছাদের নিচে আছে দুটি মানুষ, যে-যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ কারুর দিকে তাকায় না সোজাসুজি। দুজনে সকালে আলাদা চা খায়, বর্ণা অধিকাংশ সময় কাটায় নিজেদের ঘরে, রাত্রে ফিরে রজত কী খাবে তা রান্না করার নির্দেশ দেয় হারুকে, কিন্তু সে এক টেবিলে খেতে বসে না। রজত যখন থাকে না, তখন বর্ণা একতলায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসে। দুপুরে সে চাকরি খুঁজতে বেরোয়, হঠাৎ সন্ধেবেলা বন্ধু বা আত্মীয়দের মধ্যে কেউ ওপরতলায় দেখা করতে এলে বর্ণা শরীর খারাপ বলে আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকে। রজত সকালবেলা অনেকক্ষণ কাগজ পড়ে। একটা কথাও উচ্চারণ করে না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়, ফেরে বেশ রাত করে। বসবার ঘরের একটা ড্রয়ারে সে হাজার দু-এক টাকা রেখে দিয়েছে, অফিস যাবার আগে রোজ শব্দ করে সেই ড্রয়ারটা খোলে, আরও কিছু টাকা রেখে দেয়।

ছেলেমেয়েরা আর এলো না। তারা মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে বহরমপুর বেড়াতে যাবে ঠিক করে ফেলেছে, সেখানে দাদুর বাড়িতে পুজো হয়, যাত্রা হয়। বর্ণা একবার মধ্যমগ্রামে গিয়ে ওদের কিছু টাকা দিয়ে এসেছে। রজত মায়ের কাছ থেকে এসব খবর পায়। এক দিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুপুরে ওরা কলকাতায় এসেছিল জামা-প্যান্ট কিনতে, ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। রজতের সন্দেহ হয়, মা এত বুদ্ধিমতী, মা কি বুঝতে পারেননি যে বর্ণার সঙ্গে তার কথা বন্ধ ? মা কিছুই উল্লেখ করেন না। মা বুঝেছেন, এই ব্যাপারে মাথা গলাতে নেই।

রজত ছেলেমেয়েদের কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ছেলেমেয়েরা বাবার জন্য অত ব্যাকুল হবে কেন ? বাবা তো তেমন কাছের মানুষ নয়। তা ছাড়া মামাবাড়িতে ওরা সমবয়সী বন্ধু পেয়েছে, সেই সঙ্গে পুজোয় বেড়াতে যাবার উত্তেজনা। এক হিসেবে ভালোই হয়েছে, ছেলেমেয়েরা এখানে নেই, ওদের কাছ থেকে বাবা-মায়ের ঝগড়া লুকোনো যেত না !

আগে, প্রায় প্রতি দিনই একবার বর্ণা টেলিফোন করত অফিসে। রজত বেরিয়ে আসার পরই তার কিছু না-কিছু কথা মনে পড়ে যেত। বাড়ি ফেরার সময় কোনও জিনিস কিনে নিয়ে যাবার কথা জানাত। নিছক কাজের কথাই নয়, কোনও দুপুরে হঠাৎ সারা আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলে বর্ণা আবদারের সুরে বলত, আজ তুমি তাড়াতাড়ি ফিরবে ? অত কাজ করতে হবে না, প্লিজ বিকেল বিকেল চলে এসো।

এখন আর বর্ণার ফোন করার প্রশ্নই ওঠে না। তবু টেবিলের ফোনটা বেজে উঠলেই রজতের প্রথমেই মনে হয়, বর্ণা ?

অন্য ফোন যখন আসে, রজত এক হাতে সেটা ধরে হুঁ হাঁ বলতে বলতে অন্য হাতের কলমে ফাইলের অঙ্কে টিক দিয়ে যায়। ওসব কথা মন দিয়ে না শুনলেও চলে।

একবার ফোনটা যেন বেশি ঝনঝন করে বাজলো। এ রকম হয়, যন্ত্রটা যেন বুঝতে পারে অন্য পক্ষের ব্যস্ততা। এ রকম আওয়াজ শুনলেই রজতের মনে হয়, বাড়িতে কারুর বুঝি কোনও বিপদ ঘটেছে।

একটি পুরুষ কণ্ঠ বললো, আমি দ্বিজেন বলছি রে, রজত। বাড়িতে তোকে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও পাইনি। তোর সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে।

রজত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর শুনলো, নিস্পৃহ গলায় বললো, কী দরকার ?

দ্বিজেন বললো, তা টেলিফোনে বলা যাবে না। তোর সঙ্গে কোথাও দেখা হতে পারে ?

রজত বললো, আমার সঙ্গে তোর কী এমন দরকার থাকতে পারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারছি না তো ?

দ্বিজেন বললো, দরকার না থাকলে কি এমনি এমনি তোর খোঁজাখুঁজি করছি ? শোন, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের মধ্যে সরকারের যে সার্কিট হাউস আছে, তার একটা ঘরে আমাদের একটা মিটিং চলছে। তিনটের সময় শেষ হয়ে যাবে। মোটামুটি সাড়ে তিনটে থেকে আমি ফ্রি, একাই থাকব। তোদের অফিসের তো খুব কাছে, তুই একবার চলে আসতে পারবি ? এখানে আসতে যদি তোর আপত্তি থাকে, আমি তা হলে তোর অফিসে গিয়ে দেখা করতে পারি। একটু নিরিবিলিতে বসা দরকার।

রজত বুঝতে পারলো, সে যেতে রাজি না হলেও দ্বিজেন আসবেই। দ্বিজেন বেশ পরিচিত এম এল এ। অ্যাসেম্বলিতে টেবিল চাপড়ায়, মাঝে মাঝে কাগজে তার ছবি বেরোয়। অফিসের অনেকে তাকে চিনতে পারবে, তারা কৌতূহলী হবে।

রজত বললো, ঠিক আছে, আমিই যাব তোর কাছে। সাড়ে তিনটের সময়।

অফিস থেকে অসময়ে বেরুতে হলেও রজতকে অনুমতি নিতে হয় না। শুধু কোনও একজন সহকর্মীকে জানিয়ে গেলেই হলো।

রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখতে পেল প্রভাতীকে।

উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে, অন্য দিন সাড়ে পাঁচটার পর তাকে দেখা যায়, আজ এখন তিনটে কুড়ি। এ সময় ও কোথায় যাচ্ছে ? কেমন যেন ব্যস্ত ভঙ্গি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগটা নেই, একটা চটির স্ট্র্যাপ বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে, একটা পা টেনে টেনে চলছে। রাস্তার অন্য কোনও লোক ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। পুরুষের চোখ টানার মতন কোনও বিশেষত্ব নেই ওর শরীরে।

রজতের একবার মনে হলো, সত্যিই কি প্রভাতী নামে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে, না সবটাই অলীকের প্রতিচ্ছবি ?

গত কুড়ি বছর ধরে নীলকণ্ঠ ঘোষাল সম্পর্কে রজত কিছু জানার চেষ্টা করেনি। শুধু নামটা তার মনে ছিল, ঠিকরে বেরিয়ে আসা দুটি চোখ, কপালের ওপরে ওঠা দুটি ভুরু, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে আকুল মিনতি। শুধু গলার আওয়াজ নয়, সেই গলাটাও, আধপাকা পেয়ারা রঙের গলা, সেই গলার প্রতিটি ভাঁজ, সে গলা রজত পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটেছিল। কিন্তু সেই মানুষটির সংসারে আর কে কে আছে, তারা কোথায় থাকে, সে সম্পর্কে রজতের কোনও ধারণাই ছিল না।

তার অফিসের গাড়ির সামনে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল যে

www.BanglaBook.org

মেয়েটি, তাকে ওই নীলকণ্ঠ ঘোষালের মেয়েই হতে হবে কেন ? অন্য কোনও মেয়ে হতে পারত না ? অন্য কোনও মেয়ে হলে কোনও ঝামেলাই ছিল না। রজত নিজেই কি তার অবচেতনের শক্তি দিয়ে এই মেয়েটিকে টেনে এনেছে ? তারপর থেকে এই মেয়েটির সঙ্গে এত ঘন ঘন দেখাই বা হবে কেন ? সবটাই কি রজতের বানানো ?

রজতের খুব ইচ্ছে হলো, দরকার নেই দ্বিজেনের কাছে যাওয়ার, সে প্রভাতীকে অনুসরণ করবে। একবালপুরের সেই মাঠকোঠাটা সত্যি কি না, সেটা রজতের ভালো করে জানা দরকার। সিকিউরিটি এজেন্সি হয়তো তাকে ভুল খবর দিয়েছে, এ মেয়েটি সেই অবসরপ্রাপ্ত, নিহত শিক্ষকের কেউ নয়।

প্রভাতী একটা চলন্ত মিনিবাসে হাত দেখিয়ে উঠে পড়লো। বাসটা যেই চলে গেল, আর প্রভাতী নেই। রজতের মনে হলো, তা হলে একটু আগে সে প্রভাতীকে দেখেনি, সবটাই মনের ভুল। মরীচিকা !

দরজা খুলে দিল দ্বিজেন নিজেই। সাদা প্যান্টের ওপর একটা হালকা নীল হাওয়াই শার্ট পরা, চওড়া বুক, পেটানো স্বাস্থ্য। রজতেরই সমবয়সী, রজতের যেমন চুল পেকে গেছে অনেক, দ্বিজেনের তেমনই টাক পড়ে গেছে তাড়াতাড়ি। কলেজজীবনে তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল।

ঘরের মধ্যে রয়েছে আরও তিনটি যুবক। এদের মুখগুলি খুব পরিচিত, যে-কোনও ক্ষমতাশালী নেতাদের সঙ্গে এদের মতন মুখ দেখা যায়। এরা নেতাদের কাছাকাছি চিরকাল ঘুরঘুর করবে, ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পাবে, নিজেরা কোনও দিন নেতা হতে পারবে না।

দ্বিজেন ওদের দিকে চেয়ে বললো, এই, তোরা এখন বাইরে যা। রজতের সঙ্গে আমার আলাদা কথা আছে।

তিন জনের মধ্যে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। এক জন দ্বিজেনের সঙ্গে চোখাচোখি করে বসেই রইলো অলস ভঙ্গিতে। ওই ভঙ্গিটাও রজতের পরিচিত। ওর কাছে কোনও অস্ত্র আছে।

দ্বিজেন জিজ্ঞেস করলো, কী খাবি, রজত ? চা, না ঠাণ্ডা কিছু। কোনও খাবার আনাবো ?

রজত বললো, কিচ্ছু না।

দ্বিজেন বললো, বোস, বোস। মাসিমা কেমন আছেন ?

www.BanglaBook.org

রজত দু'বার মাথা নাড়লো।

দ্বিজেন বললো, জানিস, তোর বউ, বর্ণা, তাকে আমার বউ মমতা খুব ভালো চেনে। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। কালকেই বললো আমাকে। এত ব্যস্ত থাকি, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলারও সময় পাই না। এক দিন তোর বউকে নিয়ে আসবি আমার বাড়িতে ?

রজত রুক্ষভাবে বললো, তুই যদি আমার সঙ্গে এইসব ব্যক্তিগত কথা আলোচনা করতে চাস, দেন আস্ক দিস চ্যাপ টু গো এল্‌সহোয়ার !

দ্বিজেন একটু সচকিত হয়ে বললো, ও হ্যাঁ, বিল্টু, তুই বরং নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমার গাড়িটা পাঁচটার সময় আসবে।

যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, রজতের দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল। তার পায়ে পায়ে অনিচ্ছা।

পুরনো আমলের মস্ত বড় ঘর, সোফাগুলো তেলচিটে, অন্ধকার অন্ধকার ভাব, আরশোলার গন্ধ। রজত বসেছে দ্বিজেনের চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে। কলেজজীবনে দ্বিজেন ভালো টেবিল টেনিস খেলত, ফার্স্ট ইয়ারে রজত ওর সঙ্গে জুটি বেঁধে ইন্টার কলেজ চাম্পিয়নশিপে একবার খেলেছিল। প্রথম দিকে অপুর সঙ্গেও ওর বেশ ভাব ছিল। অপুই দ্বিজেনকে মার্কসবাদে দীক্ষা দিয়েছে। স্টুডেন্ট ফেডারেশন যখন ভাগ হয়ে গেল, তখন দ্বিজেন রয়ে গেল অন্য দিকে। অপু সরে যাওয়াতেই দ্বিজেন নেতা হবার পথে এগোয়। অপু আর রজত গ্রামে চলে যাবার আগে দ্বিজেনের সঙ্গে দেখা হতো মাঝে মাঝে, তর্কবিতর্ক হত। শেষের দিকে মারামারি শুরু হয়ে যায়। তখন রজত একবারও দ্বিজেনের মুখোমুখি হয়নি। হলে, পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াত নিশ্চয়ই।

সোজাসুজি দ্বিজেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে রজত জিজ্ঞেস করলো, জরুরি কথাটা কী ?

দ্বিজেন বললো, তুই আবার ওই মেয়েটার কাছে যাচ্ছিস ? ওর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করিস ?

রজত একটু চমকে গেলেও সে ভাব না দেখিয়ে জোর দিয়ে বললো, কে বলেছে ?

দ্বিজেন বললো, আমাদের কাছে খবর আছে। ভালো করে খবর না নিয়ে আমি তোকে ডাকিনি।

—তোদের কাছে সব খবর থাকে, তাই না ?

—এলাকার সব খবর রাখতেই হয়। নইলে পার্টি চালানো যায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, সরকার চালানো যায় না !

—সব খবর রাখিস ? তোদের পার্টির লোকেরা যে জোর-জার করে টাকা আদায় করে, বেনামীতে কন্ট্রাক্টারি করে, প্রোমোটার-সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এ সব খবরও রাখিস ?

—রজত, তুই ওসব খবরের কাগজের কথায় বিশ্বাস করিস ? ওই সব যারা করে, তারা কেউ আমাদের পার্টির লোক নয়। আমাদের পার্টি অনেক দিন ধরে পাওয়ারে আছে বলে কিছু অসাধু লোক আমাদের পার্টির নাম করে ওই সব কাজ চালাচ্ছে, তা আমরা জানি, তাদের আমরা ধরার চেষ্টা করি। পুলিশের ওপর পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে, বে-আইনি কাজ যারাই করবে, তাদেরই ধরতে হবে। আমাদের পার্টির নাম করুক বা যা-ই করুক।

—তোদের পার্টি মেম্বাররা কেউ কিচ্ছু করে না এরকম ?

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি, দু'চারজন থাকতেই পারে। আগে সৎ, ভালো কর্মী ছিল, হঠাৎ কোনও প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েছে, এরকমও হয়, কিন্তু আমরা সব সময় সজাগ থাকি, প্রমাণ পাওয়া গেলে সে রকম মেম্বারদের সঙ্গে সঙ্গে এক্সপেল করা হয়। কেউ কেউ শাস্তির কথা আগে থেকেই টের পেয়ে ডিসিডেন্ট সেজে যায়।

—আমরা যখন ছাত্র ফেডারেশন করতাম, তখন জোর করে কারুর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছি ? ওই সব ব্যাপার আমরা ঘেন্না করতাম না ? এখন যে-কোনও কলেজে গিয়ে দ্যাখ, নতুন সেশান শুরু হবার সময় ইউনিয়নের নেতারা কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রত্যেক নতুন ছাত্রের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে। ওপর মহলের প্রশ্রয় ছাড়া এটা হতে পারে ! তোদের খবর সংগ্রহের নেট ওয়ার্ক এ খবর রাখে না ?

—প্রত্যেক কলেজে নয়, কোনও কোনও কলেজে এরকম হতে পারে। জানতে পারলেই আমরা ব্যবস্থা নিই।

—সব কলেজ বা কোনও কোনও কলেজ, সেটা বড় কথা নয়। ছাত্ররাও বুঝে গেছে, পার্টি সরকারি ক্ষমতায় থাকলে যে-কোনও উপায়ে টাকা আদায় করা যায়। মাস্টারির চাকরি, টাকা দাও ! হাসপাতালে চিকিৎসা, টাকা দাও ! নতুন দোকান খুলবে, টাকা দাও ! বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের ঝগড়া, টাকা দাও !

—আবার তুই খবরের কাগজের ভাষায় কথা বলছিস ! দুটো-একটা বিচ্যুতি হতেই পারে। খবরের কাগজগুলো সেগুলোই

www.BanglaBook.org

ফলাও করে দেখায়। আসল কথা হলো, আমরা প্রশাসনে একটা শৃঙ্খলা আনতে পেরেছি, একটা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন সরকার চালাচ্ছি এত বছর ধরে। নইলে সাধারণ মানুষ এমনি এমনি বারবার ভোট দিয়ে আমাদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দেয় ? আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছি। গ্রামে আমরা সলিড কাজ করেছি। কৃষি উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা কতখানি এগিয়ে গেছে সে খবর রাখিস না ?

—আর শত শত কলকারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই রাজ্যেই শ্রমিকরা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে।

—কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই সে জন্য দায়ী ! দ্যাখ রজত, তোরা কি এখনও স্বীকার করবি না যে মিসগাইডেড হয়ে তোরা একটা বিপ্লব বিপ্লব খেলা শুরু করেছিলি ? এ দেশে রয়েছে এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনী, কেন্দ্রের হাতে অনেক ক্ষমতা, অনেকগুলো রাজ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার কোনও ছাপই পড়েনি, সে সব জায়গায় জাত-পাত-ধর্ম নিয়ে মেতে আছে এমনকি ছাত্ররাও, এর মধ্যে হঠাৎ পশ্চিম বাংলার মতন একটা রাজ্যে হুট করে বিপ্লব শুরু করা যায় ? দীর্ঘ প্রস্তুতি না নিয়ে একটা হঠকারিতা শুরু করলে হাজার হাজার ছেলের প্রাণই নষ্ট হয় শুধু। এ দেশে গণতান্ত্রিক পথেই এগোতে হবে আপাতত। এই সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই যতটা পরিবর্তন আনা সম্ভব... আমরা এখন সকলের সহযোগিতা চাইছি।

—তুই আমার ওপর একটা বক্তৃতা ঝাড়ছিস, দ্বিজেন ?

—ঠিক আছে, তা হলে আসল কাজের কথায় ফিরে আসা যাক। তুই আমার এলাকায় একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলি, লোকজন যে-রকম ক্ষেপে গিয়েছিল, আমি ওই সময় থানায় উপস্থিত না থাকলে—

—একটা কথা জিজ্ঞেস করি, দ্বিজেন। তুই সেদিন আমার উপকার করতে গেলি কেন ? আমি তো তোদের পার্টির লোক নই। আমি একটা লোককে মেরে যদি বে-আইনি কাজ করে থাকি, আমাকে ফাটকে পুরে দেওয়াই পুলিশের উচিত ছিল। তুই মাথা গলাতে গেলি কেন ?

—প্রথম কথা, তুই আমার কলেজজীবনের বন্ধু। তুই সে কথা স্বীকার করতে না চাইলেও আমি কখনও তা অস্বীকার করবো না। তোকে ওই অবস্থায় দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা, জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার সবাইকেই সাহায্য করা উচিত। মিউচুয়ালি যদি মিটিয়ে ফেলা যায়, তা হলে আর ঝামেলা পাকিয়ে

www.BanglaBook.org

লাভ কী ? হ্যাঁ, আমার একটা ভুল হয়েছিল, আমি স্বীকার করছি। সত্যব্রত মজুমদারকে আমার খবর দেওয়া উচিত হয়নি। আমার বউ মমতাও বললো, তুমি ওই ব্যাপারটা অন্যদের জানাতে গেলে কেন ? তোকে ওই অবস্থায় দেখবো, আমি কখনও কল্পনাও করিনি। তোর একটা রুচি আছে, বাড়িতে সুন্দরী বউ, তুই একটা অতি সাধারণ মেয়ে, একটা কল গার্লের পেছনে ছুটবি, এ কখনও ভাবা যায় ? যাই হোক, ব্যাপারটা তো ওখানেই মিটে গিয়েছিল। কিন্তু তুই আবার ও-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিস, মেয়েটার পিছু নিচ্ছিস, এতে আমার পার্টির ছেলেরা খেপে যেতে পারে। তাদের আমি কী বোঝাবো ? ওই যে বিল্টু বলে ছেলেটা এখানে বসেছিল, সে তোকে ওদিকে অনেকবার দেখেছে।

—আমি কোথায় যাবো না যাবো, সে জন্য তোর পার্টির ছেলেদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি আমাকে ?

—তুই শুধু শুধু রেগে যাচ্ছিস কেন, রজত ? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ। আমরা এখন সকলের সঙ্গে সহযোগিতা চাই। তুই আমাদের পার্টিতে যোগ না দিস, তবু আমরা আশা করবো তুই সমাজের জন্য কিছু কাজ করবি। তোদের পার্টির অনেকেই এখন আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, অনেকে গ্রামে কাজ করে, তুই শুধু শুধু একটা মেয়ের পেছনে ছুটে সময় নষ্ট করবি কেন ?

কথা থামিয়ে দ্বিজেন পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালো। জিজ্ঞেস করলো, তুই ছেড়ে দিয়েছিস ? আমি ভাই এখনও ছাড়তে পারিনি।

আজ এ পর্যন্ত দুটো সিগারেট টেনেছে রজত, হাত বাড়িয়ে দ্বিজেনের কাছ থেকে একটা নিল।

দ্বিজেন উঠে এসে লাইটার জ্বেলে রজতের সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে বললো, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না। আমি তোকে সাহায্য করতেই চাই। তোকে এখানে কেন ডেকে এনেছি, এবারে সেই আসল কারণটা বলবো।

সোফায় হেলান দিয়ে রজত বাঁকাভাবে বললো, এর পরেও একটা আসল কারণ আছে ?

দ্বিজেন বললো, আমরা কোনও কাজ হাতে নিলে তার সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড, সব কিছু জেনে নিয়ে এগোই। ওই মেয়েটি সম্পর্কেও জেনেছি। ওর নাম প্রভাতী ঘোষাল, বাবা ছিলেন হেড মাস্টার। ওর বাবা হাওড়ায় খুন হয়েছিলেন। নকশালদের কীর্তি। আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি, তুই সে কাজ করিসনি। তুই জগদীশ আচার্যর ছেলে, তোর হাতে কোনদিন অস্ত্র উঠবে না। তোর সেই সময়কার অ্যাকটিভিটি সব কি আমাদের কাছে ফাইল করা আছে। তা ছাড়া আমি তো তোকে চিনি। মারামারির সময় তুই সরাসরি কারুকে মারতে পারতিস না। বেসিকালি তোর স্বভাবে হিংস্রতা নেই। একটা ঘটনা আমার মনে আছে, তখন আমরা একই পার্টিতে ছিলাম, কলুটোলার মোড়ে কংগ্রেসের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের একটা সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল এক দিন, আমাদের বন্ধু নিখিল, একটা আধলা ইঁটের ঘায়ে তার মাথা ফেটে গেল, গলগল করে রক্ত গড়াচ্ছিল গাল বেয়ে, তুই মুখ ফিরিয়ে নিলি, চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলি, সেদিনই বুঝেছিলাম তুই রক্ত সহ্য করতে পারিস না। তোদেরই দলের কেউ, হয়তো তোর ঘনিষ্ঠ দু-একজন সেই হেড মাস্টারটিকে মেরেছিল। কী, ঠিক বলছি না ?

রজত শুকনোভাবে হাসলো শুধু।

দ্বিজেন বললো, যাক, সে তো অনেক পুরনো কথা। ও রকম অনেক ঘটনাই তখন ঘটেছিল। এই পারটিকুলার হেড মাস্টারের ফ্যামিলিটা প্রায় রুইন্‌ড হয়ে যায়। এই মেয়েটি বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি, কোনও চাকরি পায়নি, বাড়িতে অভাব, অশান্তি, অন্য লোকেরা সেই সুযোগ নিয়ে ওকে এক্সপ্লয়েট করে। তুই ওকে সেই হেড মাস্টারের মেয়ে বলে চিনতে পেরেছিস, তাই না ? আমার বউ মমতা বললো, ...মমতার আবার নকশালদের ওপর খানিকটা সিমপ্যাথি আছে, ওর নিজের এক ভাই ছিল নকশাল, মমতা বললো, কোনও প্রাক্তন নকশাল কখনও কোনও নষ্ট মেয়ের পেছন পেছন ঘুরতে পারে না। রজতবাবু নিশ্চয়ই ওই মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। তোমরা ভুল বুঝেছ !

দ্বিজেন রজতের মুখের দিকে উত্তর শোনার জন্য আগ্রহভাবে তাকিয়ে রইলো। রজত কিচ্ছু বললো না।

দ্বিজেন আবার বললো, এটা একটা অ্যাংগল হতেই পারে। তোর বন্ধুরা যে অন্যায় করেছে, এক জন নিরীহ স্কুল মাস্টারকে খুন করেছে অকারণে, তুই তার কিছুটা প্রতিকার করতে চাস, তুই ওই মেয়েটার জন্য কিছু একটা করতে চেয়েছিলি। এই ব্যাপারেও আমরা তোকে সাহায্য করতে পারি। আমরা ওই মেয়েটির জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করছি, দেখছি কোথায় লাগিয়ে দেওয়া যায়, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই, বড় জোর এক-দেড় মাস লেগে যাবে। একটা চাকরি পেলে মেয়েটা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন জীবনে ফিরে যেতে পারবে। এতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোরও খুশি হওয়া উচিত।

রজত এবার বললো, যে লোকটাকে আমি ঘুসি মেরেছিলাম, তাকে তুই চিনিস ? তার নাম মহিম গুপ্ত।

দ্বিজেন বললো, হ্যাঁ, নামটা শুনেছি, আর বিশেষ কিছু জানি না।

রজত বললো, ওই লোকটা একটি মেয়েকে নিয়ে কী উদ্দেশ্যে ওই ধরনের হোটেলে যায়, তা তোর পার্টির লোকাল ছেলেরা জানে না ? তারা এসব বন্ধ করতে পারে না ?

দ্বিজেন বললো, দ্যাখ, নৈতিকতার প্রশ্ন তুললে এটা নিশ্চয়ই খারাপ কাজ। ইম্‌মরাল। কিন্তু আইনের প্রশ্নে তা ধোপে টেঁকে না। আইন নিয়ে আমরা কী ঝামেলায় আছি, তা তো তোরা জানিস না। আমরা কোনও একটা ভালো স্টেপ নিতে গেলেই কেউ একটা মামলা ঠুকে দেয়। কোর্টে বছরের পর বছর সেই কেস চলে, অনেক সময়ই রায় আমাদের বিপক্ষে যায়। আইন পাল্টাবার ক্ষমতা তো আমাদের হাতে নেই। তুই যা বলছিলি, কোনও হোটেলে যখন এক জন লোক আর একটি মেয়ে যায়, যদি তারা অ্যাডাল্ট হয়, তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী কি না তা কী করে বোঝা যাবে ? কেউ তো আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে হোটেলে যায় না। শহরে এত হোটেল, সব জায়গায় গিয়ে এ রকম খোঁজ-খবর নেওয়াও তো অসম্ভব ব্যাপার ! তবে যদি টাকা লেনদেনের প্রশ্ন থাকে, পুলিশ ধরতে পারে।

দ্বিজেনের মুখের দিকে খরচোখে তাকিয়ে ধমকের সুরে রজত বললো, তুই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিস দ্বিজেন। প্রভাতী সম্পর্কে অত খোঁজখবর নিয়েছিস, আর ওই মহিম গুপ্ত সম্পর্কে কিছুই জানার চেষ্টা করিসনি ? তবে আমি বলছি, শুনে রাখ। মহিম গুপ্ত তোদের পার্টির মেম্বার কি না জানি না, কিন্তু তোদের পার্টির অনেক কাজ করে দেয়। মোটা টাকার চাঁদা তুলে দেয় পার্টি ফান্ডে। কালীঘাটের মন্দির অঞ্চলে সব মাস্তান ওর তাঁবে, তোদের দরকারের সময় তারা বোমা আর পাইপগান সাপ্লাই করে, ইলেকশানের সময় পাড়া কাঁপিয়ে রাখে। তোদের পার্টির নেতাদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে বলে পুলিশ ওই মহিম গুপ্তকে ছোঁয় না। এক জন ইস্কুল মাস্টারকে মেরে নকশালরা তার পরিবারের ক্ষতি করেছে, আর ওই মহিম গুপ্তর মতন লোকেরা যে কত গরিবের সংসার জ্বালিয়ে দিচ্ছে তা বুঝি জানিস না ? মন্দিরের রাস্তায় ওই মেয়েটার দাদার একটা দোকান আছে। মহিম গুপ্ত তার গুণ্ডাদের দিয়ে যে-কোনও দিন সে দোকান চুরমার করে দিতে পারে। সেই দাদাটা তার দোকান বাঁচাবার জন্য নিজের

www.BanglaBook.org

বোনকে তুলে দিয়েছে মহিম গুপ্তর হাতে। মহিম গুপ্ত শুধু ওই মেয়েটাকে ভোগ করে না, ওর দাদার অসহায়তাটাও উপভোগ করে।

দ্বিজেন বললো, যদি সে রকম হয়—

রজত গর্জে উঠে বললো, যদি ! আমি মিথ্যে কথা বলছি ?

দ্বিজেন বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ওখানকার লোকাল কমিটিকে বলবো মহিম গুপ্তর ওপর নজর রাখতে। তার বে-আইনি কাজ অবশ্যই বন্ধ করা হবে। আপাতত একটা সমস্যার তো সমাধান করা যাচ্ছে, মেয়েটার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ও এই নোংরা জীবন থেকে সরে গিয়ে বাঁচতে পারবে। তোকে অন্তত আর সে জন্য ও-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে হবে না।

রজত বললো, মেয়েটার চাকরির ব্যবস্থা করে খুব মহত্ত্ব দেখাচ্ছিস ! মেয়েটাকে সরিয়ে দিলে ওর দাদার দোকান বাঁচবে ? দোকানটা তো শেষ করে দেবেই, ওকেও প্রাণে মেরে দিতে পারে।

দ্বিজেন বললো, ওর দাদার দোকানের যাতে ক্ষতি না হয়, সেটাও আমি দেখবো। তার গায়ে কেউ হাত দেবে না।

রজত বললো, এর পর ওই মহিম গুপ্ত অন্য সব দোকানদারকে ধরবে, তাদের বউ বা মেয়ে বা বোনকে ডায়মন্ড হারবার রোডের হোটেলে নিয়ে যাবে। কিছু কিছু দোকানদারকে এরকম ভয় দেখিয়ে না রাখলে টাকা উঠবে কী করে ? এরা তোদের পার্টির হাতে গড়া দৈত্য। এই ধরনের হোটেলগুলোয় মহিম গুপ্তর মতন লোকদের অবাধ যাওয়া-আসা চলবে, কারণ হোটেলগুলোও তোদের পার্টিকে মোটা চাঁদা দেয় !

এবার দ্বিজেনও রেগে উঠে বললো, তুই বারবার চাঁদা চাঁদা করছিস ! হ্যাঁ, চাঁদা নিতে হয়ই তো। সব পার্টিই চাঁদায় চলে। কিন্তু তুই মহারাষ্ট্রে কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছিস না ? মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটকে, দিল্লিতে পার্টির নামে চাঁদা তুলে এক-এক জন নেতা কোটি কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ভরছে। প্রাইম মিনিস্টারের নামে পর্যন্ত ষাট কোটি টাকা ক্যাশ নেবার অভিযোগ উঠেছিল। আমাদের পার্টিতে ওসব কিচ্ছু হয় না। চাঁদা তোলা হয় তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কেউ তা ব্যক্তিগত ভোগে লাগায় না, হিসেব পরিষ্কার থাকে, সব কিছু ক্লিন।

রজত বললো, রক্ত মাখা, নোংরা টাকা, অনেক ধুয়ে মুছে ক্লিন করে নিতে হয়।

দ্বিজেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, এভাবে তর্কের কোনও শেষ হবে না, রজত। সমস্ত দোকানদার আর তাদের বউ-বোনদের নিয়ে

www.BanglaBook.org

তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। এক জনের সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে। তুই এখন রাজনীতিতে নেই, এখনকার পরিস্থিতিতে কীভাবে পার্টি চলে তুই বুঝবি না।

রজত উঠে দাঁড়ালো, তাকে এবার অফিসে ফিরতে হবে।

দ্বিজেন কাছে এসে নিচু গলায় বললো, আর একটা কথা, যদিও পার্সোনাল, তবু জিজ্ঞেস করছি। তোর বউ বর্ণা নাকি চাকরি খুঁজছে ? মমতার দাদার অফিসে গিয়েছিল, ...হঠাৎ এত দিন বাদে !

রজত একবার ভাবলো, এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না।

তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে উদাসীনভাবে বললো, বর্ণা লেখাপড়া শিখেছে, তার যদি চাকরি করার ইচ্ছে হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

॥ ৯ ॥

অফিস প্রায় খালি হয়ে গেছে, কাজ করে যাচ্ছে রজত। তার কাজ নানা রকম গ্রাফ, চার্ট আর সংখ্যা নিয়ে। এইসব নিয়ে কাজ করার একটা প্রধান গুণ, একেবারেই অন্যমনস্ক হওয়া যায় না। টানা কোনও লেখায় খানিকটা পড়ে চোখ ফেরানো যায়, কিন্তু অঙ্কের এক ধাপের পর আর এক ধাপ যেতেই হবে। শব্দে বানান ভুল তবু চলে, সংখ্যা কোনও ভুল সহ্য করে না। শূন্যগুলো সব রূপক, তারা লাফালাফি করে মাথার মধ্যে।

একটা রিপোর্ট তৈরি করার পর সেটা পার্সোনাল কম্পিউটারে ঢোকাতে হবে। রজতের কাচের ঘরটা ঠাণ্ডা, ক্রমশই ঠাণ্ডা বাড়ছে। টাই আলগা করে, জামার হাতা গুটিয়ে নিয়েছে রজত, স্ক্রিনের দিকে তার চোখ। এক সময় স্ক্রিনটা সাদা হয়ে গেল।

রজত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হল, আর সময় নেই। আর এক মিনিটও নষ্ট করা যাবে না। যা করার আজই সেরে ফেলতে হবে। আজই।

প্রায় দৌড়ে সে বাথরুমে গিয়ে দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এখান থেকেই সোজা চলে যাবে সে। দ্বিজেনকে কিছুতেই জিততে দেওয়া চলবে না। একটা কিছু সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন আগে অফিসের কলিগ্‌দের মধ্যেই টেবিল-টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে রজত একটা সুটকেস উপহার পেয়েছিল। ছোট সুটকেস, প্লেনে সফর করার উপযোগী। সে সুটকেসটা বাড়ি নিয়ে যায়নি, তার নিজস্ব

www.BanglaBook.org

আলমারিতে রাখা আছে। ও রকম সুটকেস তার আরও আছে কয়েকটা। অফিসের আলমারিতে এ রকম অনেক কিছু থাকে। একবার এক জোড়া মদের বোতল ও ছ'টা গেলাস পেয়েছিল, তাও বাড়িতে নেয়নি।

বাথরুম থেকে বেরিয়েও পাশের একটা টিনের দরজা সে জোরে ঠেলে খুলে ফেললো। এটা অফিসের ইলেকট্রিসিয়ানের টুল-রুম। অনেক রকম তার, বালব আরও যন্ত্রপাতি রয়েছে। রজত দ্রুত আঙুলে সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।

প্লায়ার্স, রেন্‌চ, স্ক্রু-ডাইভার, তুরপুন, লোহার ব্রাকেট—এগুলো চলবে না। খুঁজতে খুঁজতে রজত একটা হাতুড়ি পেয়ে গেল। হ্যাঁ, বেশ ভারী আছে। এই রকমই দরকার। হাতুড়িটা সে ভরে নিল কোটের ভেতরের পকেটে।

নিজের ঘরে এসে সে আলমারি খুলে বার করলো সুটকেসটা, একটা মদের বোতল ভরে নিল, হাতুড়িটাও সেখানে রাখলো। দুটোতে যাতে ঠোকাঠুকি না হয়, নিজের চেয়ারের পিঠে রাখা তোয়ালেটা দিয়ে মুড়ে নিল বোতলটা।

একটু ইতস্তত করার পর সে প্রভাতী সম্পর্কে ফাইলটাও বার করে নিল। ছিঁড়তে লাগল সব কটা পাতা। একটুখানি ছিঁড়েই তার মনে পড়লো, পাশের ঘরেই রয়েছে একটা শ্রেডিং মেশিন। তার মধ্যে যে-কোনও কাগজপত্র ফেলে দিলে এমন টুকরো টুকরো হয়ে যায় যে আর চেনাই যায় না। পুরো ফাইলটা সেই মেশিনে ঢুকিয়ে সুইচ টিপে দিল রজত।

অন্য দিন অফিস ব্যাগ থাকে, আজ সুটকেস হাতে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো রজত। স্বপনকে বলে দিল গাড়ি লাগবে না, কিছুটা হেঁটে গিয়ে পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি।

একবালপুরের মোড়ের কাছে একবার ডান দিকে তাকালো না পর্যন্ত। কোনও দরকার নেই। প্রভাতীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবারও দরকার নেই। যা কিছু ঘটার তা আম্রপালি হোটেলেই ঘটতে বাধ্য।

শরীরে কোনও উত্তেজনা নেই, বেশ সহজভাবে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছে রজত। হু-হু বাতাস লাগছে তার কপালে। সন্ধে হয়ে গেছে খানিক আগে, এখন এ পথের দু'পাশে ফাঁকা জায়গা নেই-ই বলতে গেলে, দু'পাশে অনবরত দোকানপাট, আলো। জোকা পেরুবার পর অন্ধকার দেখা যায়। তাও আর বেশি দিন থাকবে না। কলকাতা শহর ছড়িয়ে যাবে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আম্রপালি হোটেলের কাছে পৌঁছে রজত ট্যাক্সি ছেড়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল। দ্বিধাহীন পায়ে ঢুকে গেল ভেতরে। কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের ঘর খালি আছে ?

শনি-রবিবার ভিড় থাকে প্রচণ্ড। এর আগে একটানা তিন দিন ছুটি গেছে, আজ সপ্তাহের মাঝখানে একটি দিন। আজ প্রায় পুরো হোটেলটাই ফাঁকা।

হোটেলের বাইরে গেটের পাশে যথারীতি চার-পাঁচজন বলিষ্ঠকায় লোক গুলতানি করছে। তারা রজতকে বাধা দেয়নি, কাউন্টারের লোকটিও তাকে চিনতে পারেনি, সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কদিন থাকবেন ?

রজত আগেই ঠিক করে এসেছিল, বললো, তিন দিন।

এখানে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। পার্স খুলে টাকা দেবার সময় রজত নিজের নাম বললো, অনিমেষ চৌধুরী। অতি সাধারণ নাম, এই নামে কত লোক থাকতে পারে, কাউন্টারের লোকটি কোনও কৌতূহলও প্রকাশ করলো না।

দোতলায় পাঁচ নম্বর ঘর। ভেতরে একটি ডাবল বেড, একটি ড্রেসিং টেবল ও টুল, চেয়ার-টেয়ারের কোনও বালাই নেই। সংলগ্ন বাথরুমের মেঝেতে শ্যাওলা, একটা কালচে হয়ে যাওয়া বালতি ও মগ, কমোডের ফ্লাশ কাজ করে না। রজত এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করেনি।

ঘরের জানলা খুলে দিলে দেখা যায় একটা অস্পষ্ট বাগান। রজত সেই জানলার কাছে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে একটি বেয়ারা বিনা ভূমিকায় ঢুকে এসে বললো, স্যার, আপনার কী লাগবে ? সোডা এনে দেবো ? ফিস ফিংগার, ফিস টিকিয়া, বোনলেস চিকেন, রেশমি কাবাব আজ স্পেশ্যাল হয়েছে স্যার।

রজত লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এরা সব জানে। কারা আসে, কেন আসে, দু-এক ঘণ্টা বা এক রাতের অতিথিরা কোন ধরনের মানুষ কিছুই এদের অজানা নয়। এদের সব মূল্যবোধ চাপা পড়ে যায় বখশিসে। হয়তো গ্রাম থেকে এসেছে এই লোকটি, বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, সেখানে এই লোকটির ভূমিকা কী ?

রজত বললো, কিছু চাই না।

লোকটি বললো, বোতল আনতে হবে স্যার ?

এখানে যারা আসে, অর্ধেক তো বোতল-বিলাসী হবেই। এদের নিজেদেরই স্টক আছে, আনিয়ে দেবার নাম করে প্রতি বোতলে বেশি

www.BanglaBook.org

পয়সা নেবে। বার লাইসেন্স নেই। প্রতি সপ্তাহে কিছু টাকা দিতে হয় থানায়, কিছু টাকা পার্টির লোকদের।

রজতের নিজের কাছে বোতল আছে। তবু সেই মুহূর্তে সে ঠিক করে ফেললো, আজ মদ খাবে না।

সে বললো, না, এখন যাও। দরকার হলে ডাকবো।

খাটের এক পাশে স্থির হয়ে বসে রইলো রজত। একটা সিগারেট ধরালো। দিনের চতুর্থ সিগারেট। আজ হয়তো সিগারেটের র‍্যাশান মানা যাবে না।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার ঠিক নেই। তবে মহিম ও প্রভাতীকে আসতেই হবে।

রজতই তো ওদের সৃষ্টি করেছে। ওরা কোথায় ছিল এত দিন? এই কুড়ি বছর ধরে রজতের জীবনে ওদের কোনও স্থানই ছিল না। হঠাৎ এত দিন বাদে সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়লো কী করে? রজতের অবচেতনই ডেকে এনেছে ওদের।

সেই জন্যই ওদের আসতে হবে এখানে। রজতের ইচ্ছের জোরই ওদের ডেকে আনবে, আজ না হোক কাল, কিংবা পরশু, আসতে ওদের হবেই। রজতের কোনওই চাঞ্চল্য নেই, সে অপেক্ষা করবে।

একা একা সময় কাটাবার জন্য মদ বেশ ভালো সঙ্গী। কিন্তু রজত মদ খাবে না, তার কারণ সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, নেশার ভুল যুক্তিতে কিছু করতে চায় না। সে স্বচ্ছ মনে, বিশুদ্ধ বিবেক নিয়ে ওদের মুখোমুখি হবে।

একটা বইও আনেনি রজত। কিন্তু সে একটুও অস্থিরতা বোধ করছে না, একই রকম ভঙ্গিতে বসে রইল অনেকক্ষণ।

ছোটবেলায়, তখন রজতের বয়েস দশ-এগারো, বাবা এক-এক দিন সকালে রজতকে নিয়ে যেতেন বাজারে। বাবার একটা থিয়োরি ছিল, বাজারের জিনিসপত্রের দাম বাড়া-কমা, লোকজনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে দেশের অবস্থা ঠিক বোঝা যায় না। শুধু খবরের কাগজ পড়লে বরং ভুল ধারণা হয়।

রজতের অবশ্য বাজারের ভিড়, প্যাঁচপেচে কাদা, মাছের গন্ধ পছন্দ হত না। তার চেয়ে খেলার দিকে তার মন ছিল বেশি। কিন্তু সেই বয়সে বাবার কথার প্রতিবাদ করার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বাবা রজতকে নানা রকম শাক-সব্জি চেনাতেন, বেগুন টিপে টিপে দেখাতেন, কোনটা ভালো, কোনটায় বিচি বেশি। মাছের বাজারেই বাবা বেশিক্ষণ সময় কাটাতেন, রজতের মাছ চেনায় কোনও আগ্রহ

www.BanglaBook.org

নেই দেখে কয়েক দিন পর তিনি রজতকে দাঁড় করিয়ে রাখতেন একটা আলুর দোকানের সামনে। সবজির থলিটা রজতকে দিয়ে বলতেন, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি খোকা, কোথাও যাবি না।

মাছের বাজারে সবটা জায়গা ঘুরে ঘুরে, সব রকম মাছ না দেখে বাবা কিছু কিনতেন না। চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা হলে জুড়ে দিতেন গল্প, কেটে যেত আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা। এমনও হয়েছে, কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাবা বেরিয়ে চলে গেছেন বাজারের বাইরে। ছেলের কথা মনেই নেই। বাড়ি খুব দূরে নয়, রজত রাস্তাও চিনত, কিন্তু রজত তবু দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে, হয়তো দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। বাবা আবার দৌড়ে ফিরে এসে দেখতেন, তাঁর ছেলে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এক পা-ও নড়েনি। দা বয় স্টুড অন দা বার্নিং ডেক !

তার মাত্র সাত-আট বছর পরেই বাবার কাছ থেকে কত দূরে সরে গেল রজত ! বাবা তো রজতকে আঁকড়ে ধরে রাখতেই চেয়েছিলেন, রজত থাকল না, এখন সে তার নিজের ছেলেমেয়েকে যতই কাছে পেতে চাক, তারা থাকবে কেন ?

এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট পর রজত উঠে দাঁড়াল। জামা-প্যান্ট ছাড়া যাবে না। যদি দু দিন বা তিন দিন থাকতে হয়, এক প্রস্থ পোশাক আনা উচিত ছিল। আসার পথে কিনেও আনা যেত। এটা মনে পড়েনি। ওরা আসবে না ? রজত তীব্র চোখে জানলার দিকে তাকালো। আসতেই হবে, মহিমকে আসতেই হবে, ও যেখানেই থাক, ওকে টেনে আনতেই হবে।

কিছু খেতেও ইচ্ছে করছে না। মাথার ওপরে যখন একটা বোঝা চেপে থাকে, তখন খিদে পায় না রজতের। তা ছাড়া রজত এখন অপু। দিনের পর দিন অপু না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারত।

পুরো হোটেলটা একবার ঘুরে দেখা দরকার। বাইরে বেরিয়ে এল রজত। লম্বা টানা বারান্দার এক পাশে সারিবদ্ধ ঘর। কোনও ঘরেই আলো জ্বলছে না। মানুষের সাড়াশব্দ নেই। একতলায় অফিসঘরে টিভি চলছে।

একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। অর্থাৎ তিনতলাতেও কিছু আছে। শুধু ছাদ হলে সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করা যেতে পারে।

তিনতলাতেও একই রকম বারান্দা, একই রকম পর পর ঘর। তবে এখানে অন্তত দুটি ঘরে লোকজন আছে বোঝা যায়। রজত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারান্দাটা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল, একটি ঘরে তিন-চার জন নারী-পুরুষের হাসি ও কথার টুকরো শোনা গেল, অন্য ঘরটিতে আলো জ্বলছে কিন্তু নিঃশব্দ।

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো রজত। এখানটায় অন্ধকার। আজকের আকাশও মেঘলা। নিচের বাগানে কয়েকজন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সিমেন্টের গোল বেদীর ওপর আড্ডা জমিয়েছে তিন-চার জন, তাদের মুখ দেখা যায় না। মহিম কি ওখানে থাকতে পারে ?

রজত উৎকর্ণ হয়ে নিচের লোকদের গলার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল। না, শোনা যায় না। রাস্তা দিয়ে ভারী ভারী বাস ও ট্রাক যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই বিকট আওয়াজ ধাক্কা মারে কানের পরদায়।

নিচের লোকদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করতে করতে রজতের একটা খটকা লাগল। যে-ঘরটায় তিন-চার জন নারী-পুরুষ এক সঙ্গে হাসি-গল্প করছে, সেই ঘরটার পাশ দিয়ে আসবার সময় রজত কোনও মনোযোগ দেয়নি, বরং আলো-জ্বলা শব্দহীন ঘরটা সম্পর্কেই তার কৌতূহল হয়েছিল। এবার রজত ফিরে এল প্রথম ঘরটার কাছে, দরজায় কান লাগালো।

রজত আচার্য, বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছে, একটা নামজাদা কোম্পানির ফিনান্স ম্যানেজার, তার পক্ষে এরকম একটা অসম্ভ্রান্ত হোটেলে, চুপি চুপি অন্যের দরজায় আড়ি পাতা একেবারেই মানায় না। কেউ দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। কিন্তু রজত নামে যে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণটি বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত, অনেককে অনুসরণ করেছে ও অনুসৃত হয়েছে, পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে থেকেছে কত ঘুপচি অন্ধকার ঘরে, তার পক্ষে এটা খুবই সম্ভব ছিল। এই কুড়ি বছরেও রজত অফিসার হতে পারল না ! চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি সে।

দুটি মেয়ে ও দুটি পুরুষ। এক জন পুরুষ নিশ্চিত মহিম গুপ্ত। সেই মাস কয়েক আগে এখানে লোকজনদের হাতে মার খাওয়ার সময় রজত ওই মহিম গুপ্তের মুখে দু' তিনটি বাক্য শুনেছিল মাত্র, তবু তার গলার আওয়াজ সে ভুলবে কী করে ?

রজত তার সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরন টের পেল। তা হলে তার ধারণা ঠিক হয়েছে। রজতের ইচ্ছেমতন মহিম এখানেও পৌঁছে গেছে। না এসে ওর উপায় ছিল না।

ঘরের মধ্যে অন্য লোক আছে, রজতকে অপেক্ষা করতে হবে। রজত

www.BanglaBook.org

ছটফটিয়ে সরে গিয়ে পাশের ঘরগুলোর দরজা ঠেলে ঠেলে দেখল। সব ঘর চাবি বন্ধ। রজতের পক্ষে এখন দোতলায় নিজের ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়।

দোতলায় প্রায় দৌড়ে নেমে গিয়ে সে সুটকেস খুলে হাতুড়িটা জামার মধ্যে নিয়ে আবার ফিরে এল ওপরে। মহিমের ঘরটায় খানাপিনা চলছে। রজত একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার রেলিং ধরে। এখন সে আর নিচের লোকজনদের দেখছে না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বেজে উঠেছে পাগলা ঘণ্টি। অপু পাঁচিলের ওপর উঠে পড়েছিল। তবু সামান্য দেরি করেছিল মনোজের জন্য। মনোজ দড়ি বেয়ে উঠতে পারছিল না। সেই সামান্য দেরিটাই মারাত্মক হল। রজত যদি সেখানে উপস্থিত থাকত, মনোজকে ঠেলে তুলে দিত। মনোজও বাঁচল না। তিনটে রাইফেলের গুলি লেগেছিল অপুর পিঠে, খুব ভাল সাঁতার জানত অপু, তবু আদি গঙ্গা পেরুতে পারল না।

রজতের বদলে যদি অপু বেঁচে থাকত ? সে কি কল্যাণের মতন সমাজ সেবায় ডুব দিত, না জ্বেলে রাখতো বিপ্লবের আগুন ? বার্লিনের পাঁচিল গুঁড়ো হয়ে গেল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপের সাহায্য-নির্ভর কৃপার পাত্র হয়ে পড়ল, চীন এখন শুধু হাত মেলানো নয়, কোলাকুলি করছে বাজার-অর্থনীতির সঙ্গে। এই রকম অবস্থায় অপু বেছে নিত কোন পথ ? বিপ্লবের পরবর্তী কোন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখবে এখনকার তরুণরা ? রজত এ সবের উত্তর খুঁজে পায় না, কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা, অপু নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিতে পারত নতুন কোনও পথ। তার জীবনের বিনিময়ে অপুর বেঁচে থাকা অবশ্যই উচিত ছিল !

নুরুল প্রায়ই বলত, দ্যাখ, তোরা কে কী বিশ্বাস করিস আমি জানি না, কিন্তু আমার তো পরজন্ম সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। আত্মার অবিনশ্বরতাও মানি না। একটাই মানব জীবন, তারপরই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। স্বর্গ নেই, নরক নেই, কবরের অন্ধকারে পোকামাকড়ের খাদ্য হবে এই শরীর। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, মরার আগেই যেন দেখে যেতে পারি, কোনও মানুষের সঙ্গেই কোনও মানুষের উঁচু-নিচু ভেদ নেই।...জেল থেকে বেরুবার পর নুরুল একদিনও হাসেনি। বড় হতাশ নিশ্বাস ফেলে চলে গেছে।

www.BanglaBook.org

সিউড়িতে রাত জেগে শশাঙ্ক এখনও কত কিছু লিখে চলেছে। লেখ শশাঙ্ক, তোর যা খুশি লিখে যা। তোকে আমি সত্যি সত্যি কখনও মারতে চাইনি। তোকে মারতে যাওয়া মানে তো আমার নিজেরই যৌবনের গলা টিপে ধরা। একে একে তো সবাই চলে যাচ্ছে, তুই অতীত নিয়ে আছিস, আমাদের সেই বয়সে পড়ে আছিস, তুই-ই বোধহয় সবচেয়ে ভাল আছিস।

কবি নজরুল ইসলাম যেমন জানতেন না যে ভারত ভাগ হয়ে প্রথমে দু টুকরো, পরে তিন টুকরো হয়ে গেছে, তেমনই শশাঙ্কও এখনও জানে না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। যুগোশ্লাভিয়ায় যারা এতকাল সমাজতন্ত্রের আদর্শে এক হয়ে ছিল, হঠাৎ ধর্মের ভেদাভেদে তারা পরস্পরের সঙ্গে কী হিংস্র লড়াইয়ে মেতে উঠেছে! শশাঙ্ক জানে না, সে খবরের কাগজ পরে না, রেডিও শোনে না, টি ভি দেখে না। সে শুধু লিখে যায়। গত বছর শশাঙ্কর সঙ্গে যখন দেখা করতে যায় রজত, তখন শশাঙ্কর ছোট ভাই বিমল বসে ছিল সেই ঘরে। বিমল ছেলেটা সিনিক ধরনের, মাঝে মাঝেই টিপ্পুনি দিয়ে কথা বলে।

বিমল বলেছিল, মেজদা, তোমরা কী নিয়ে লড়তে গিয়েছিলে? সবই যে উল্টে গেল! পৃথিবীর খবর রাখো? পৃথিবীতে এখনও কিছু কিছু কমিউনিস্ট আছে বটে, কমিউনিস্ট পার্টি নামে বা বেনামে পার্টিও থাকবে, কিন্তু কমিউনিজম বলে যে আর কিছু রইল না!

শশাঙ্ক ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুই কিছু জানিস না। বিজয়দা আমাকে বলেছে, শশাঙ্ক, লি শাও চির বই এখন বাতিল হয়ে গেছে, এ বার তোমাকে লিখতে হবে, সত্তরের দশক মুক্তির দশক। আর মাত্র দু বছর বাকি আছে, বুঝলি, আর দু বছর বাদেই পুরো দেশটা মুক্তাঞ্চল!

সেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল, বেরিয়ে এল একজন পুরুষ ও নারী।

রজতের প্রথমে মনে হল, মহিম আর প্রভাতীই চলে যাচ্ছে নাকি?

তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখল, না ওরা নয়, কিন্তু প্রায় একই রকম চেহারা। এই সব লোকদের পোশাকেরও তেমন তফাৎ থাকে না। একই ভাবে হাসে। হা-হা নয়, হা-হ্যা।

মিনিট পাঁচেক দরজার সামনে গল্প করার পর সেই যুগলটি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা আবার বন্ধ। অন্য যে ঘরে শুধু আলো জ্বলছিল, এখন সেখানেও আলো নিবে গেছে, পুরো বারান্দাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছটফটিয়ে সরে গিয়ে পাশের ঘরগুলোর দরজা ঠেলে ঠেলে দেখল। সব ঘর চাবি বন্ধ। রজতের পক্ষে এখন দোতলায় নিজের ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়।

দোতলায় প্রায় দৌড়ে নেমে গিয়ে সে সুটকেস খুলে হাতুড়িটা জামার মধ্যে নিয়ে আবার ফিরে এল ওপরে। মহিমের ঘরটায় খানাপিনা চলছে। রজত একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার রেলিং ধরে। এখন সে আর নিচের লোকজনদের দেখছে না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বেজে উঠেছে পাগলা ঘন্টি। অপু পাঁচিলের ওপর উঠে পড়েছিল। তবু সামান্য দেরি করেছিল মনোজের জন্য। মনোজ দড়ি বেয়ে উঠতে পারছিল না। সেই সামান্য দেরিটাই মারাত্মক হল। রজত যদি সেখানে উপস্থিত থাকত, মনোজকে ঠেলে তুলে দিত। মনোজও বাঁচল না। তিনটে রাইফেলের গুলি লেগেছিল অপুর পিঠে, খুব ভাল সাঁতার জানত অপু, তবু আদি গঙ্গা পেরুতে পারল না।

রজতের বদলে যদি অপু বেঁচে থাকত ? সে কি কল্যাণের মতন সমাজ সেবায় ডুব দিত, না জ্বেলে রাখতো বিপ্লবের আগুন ? বার্লিনের পাঁচিল গুঁড়ো হয়ে গেল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপের সাহায্য-নির্ভর কৃপার পাত্র হয়ে পড়ল, চীন এখন শুধু হাত মেলানো নয়, কোলাকুলি করছে বাজার-অর্থনীতির সঙ্গে। এই রকম অবস্থায় অপু বেছে নিত কোন পথ ? বিপ্লবের পরবর্তী কোন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখবে এখনকার তরুণরা ? রজত এ সবের উত্তর খুঁজে পায় না, কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা, অপু নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিতে পারত নতুন কোনও পথ। তার জীবনের বিনিময়ে অপুর বেঁচে থাকা অবশ্যই উচিত ছিল !

নুরুল প্রায়ই বলত, দ্যাখ, তোরা কে কী বিশ্বাস করিস আমি জানি না, কিন্তু আমার তো পরজন্ম সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। আত্মার অবিনশ্বরতাও মানি না। একটাই মানব জীবন, তারপরই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। স্বর্গ নেই, নরক নেই, কবরের অন্ধকারে পোকামাকড়ের খাদ্য হবে এই শরীর। ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, মরার আগেই যেটা দেখে যেতে পারি, কোনও মানুষের সঙ্গেই কোনও মানুষের উঁচু-নিচু ভেদ নেই। ...জেল থেকে বেরুবার পর নুরুল একদিনও হাসেনি। বড় হতাশ নিশ্বাস ফেলে চলে গেছে।

www.BanglaBook.org

সিউড়িতে রাত জেগে শশাঙ্ক এখনও কত কিছু লিখে চলেছে। লেখ শশাঙ্ক, তোর যা খুশি লিখে যা। তোকে আমি সত্যি সত্যি কখনও মারতে চাইনি। তোকে মারতে যাওয়া মানে তো আমার নিজেরই যৌবনের গলা টিপে ধরা। একে একে তো সবাই চলে যাচ্ছে, তুই অতীত নিয়ে আছিস, আমাদের সেই বয়সে পড়ে আছিস, তুই-ই বোধহয় সবচেয়ে ভাল আছিস।

কবি নজরুল ইসলাম যেমন জানতেন না যে ভারত ভাগ হয়ে প্রথমে দু টুকরো, পরে তিন টুকরো হয়ে গেছে, তেমনই শশাঙ্কও এখনও জানে না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। যুগোশ্লাভিয়ায় যারা এতকাল সমাজতন্ত্রের আদর্শে এক হয়ে ছিল, হঠাৎ ধর্মের ভেদাভেদে তারা পরস্পরের সঙ্গে কী হিংস্র লড়াইয়ে মেতে উঠেছে! শশাঙ্ক জানে না, সে খবরের কাগজ পরে না, রেডিও শোনে না, টি ভি দেখে না। সে শুধু লিখে যায়। গত বছর শশাঙ্কর সঙ্গে যখন দেখা করতে যায় রজত, তখন শশাঙ্কর ছোট ভাই বিমল বসে ছিল সেই ঘরে। বিমল ছেলেটা সিনিক ধরনের, মাঝে মাঝেই টিপ্পুনি দিয়ে কথা বলে।

বিমল বলেছিল, মেজদা, তোমরা কী নিয়ে লড়তে গিয়েছিলে? সবই যে উল্টে গেল! পৃথিবীর খবর রাখো? পৃথিবীতে এখনও কিছু কিছু কমিউনিস্ট আছে বটে, কমিউনিস্ট পার্টি নামে বা বেনামে পার্টিও থাকবে, কিন্তু কমিউনিজম বলে যে আর কিছু রইল না!

শশাঙ্ক ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুই কিছু জানিস না। বিজয়দা আমাকে বলেছে, শশাঙ্ক, লি শাও চির বই এখন বাতিল হয়ে গেছে, এ বার তোমাকে লিখতে হবে, সত্তরের দশক মুক্তির দশক। আর মাত্র দু বছর বাকি আছে, বুঝলি, আর দু বছর বাদেই পুরো দেশটা মুক্তাঞ্চল!

সেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল, বেরিয়ে এল একজন পুরুষ ও নারী।

রজতের প্রথমে মনে হল, মহিম আর প্রভাতীই চলে যাচ্ছে নাকি?

তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখল, না ওরা নয়, কিন্তু প্রায় একই রকম চেহারা। এই সব লোকদের পোশাকেরও তেমন তফাৎ থাকে না। একই ভাবে হাসে। হা-হা নয়। হা-হ্যা।

মিনিট পাঁচেক দরজার সামনে গল্প করার পর সেই যুগলটি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা আবার বন্ধ। অন্য যে ঘরে শুধু আলো জ্বলছিল, এখন সেখানেও আলো নিবে গেছে, পুরো বারান্দাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকার।

মহিম তার ঘরের দরজাটা এমনি ভেজিয়ে রেখেছে, না কুলুপ এঁটে দিয়েছে? একেবারে বন্ধ করে দিলেও খোলানোর উপায় আছে। ব্যস্ততার কিছু নেই। এখন দেখা দরকার আর কেউ আসবে কিনা।

রজত আর একটি সিগারেট ধরাল। হোটেলের বারান্দায় যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রজত এখানে রীতিমতন বোর্ডার। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। কোথায় বাগান? কিছু দেখছে না রজত। সে শুধু দেখতে পাচ্ছে, আদি গঙ্গার জলে ভাসছে অপুর নিষ্প্রাণ শরীর।

ঘরে ঘরে ফোন নেই। রুম সার্ভিসের জন্য একটা সুইচ টিপলে বাইরে একটা লাল আলো জ্বলে, চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ হয়। লাল আলোটা রজতের চোখে কটকট করছে, সে ওদিকে তাকাতে পারছে না। গত কয়েকমাস ধরে বেশি গাঢ় লাল রং সহ্য করতে পারছে না রজত। একটা প্রবন্ধে চোখ বুলোতে বুলোতে এক জায়গায় সে আটকে গিয়েছিল। একজন আর্ট ক্রিটিক লিখেছে, কোনও ভাল ছবিতেই লাল রঙের বেশি ব্যবহার হয় না। গাঢ় লাল রঙের সঙ্গে শিল্পের একটা বিরোধ আছে।

রজত শিল্প নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কথাটা গেঁথে গিয়েছিল তার মনে।

কয়েকবার চ্যাঁ চ্যাঁ করে বাজার পর ছুটে এল একজন বেয়ারা। এখানকার আওয়াজ কি একতলাতেও শোনা যায়? হয়তো, এখানে সুইচ টিপলে একতলাতেও কোথাও ওই রকম বেল বাজে।

বেয়ারাটি দরজায় দু বার টকটক শব্দ করার পর খুলে ফেলল। ভেতর থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ জমিদারি মেজাজে বলল, দুটো সোডা দিয়ে যা। যখন ডাকব, আসবি!

রজত চিনতে পারল, এই বেয়ারাটিই তার ঘরে এসেছিল। এই লোকটি কি কখনও নিজের সংসারের জন্য বাজার করে? নিজের ছেলেকে বাজারে সঙ্গে নিয়ে যায়? আলুর দোকানে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রাখে? এদের জীবন কোনওদিন জানা হবে না। মহিমের বাল্যকালটাই বা কীরকম ছিল?

বেয়ারাটি অবিলম্বে দু বোতল সোডা এনে, ভেতরে ঢুকে একটুক্ষণ কী সব বলল। আবার সে বেরিয়ে যাবার জন্য টেনে দিল দরজা।

তারপরেও মিনিট সাতেক অপেক্ষা করল রজত। তিনতলাটা একেবারে শুনশান, আর কোনও শব্দ নেই।

www.BanglaBook.org

এ বার দেখতে হবে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ কিনা। নিশ্চিন্ত ভাবে এগিয়ে গেল রজত। বাইরের হ্যান্ডেল ধরে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। খাটের ওপর আধ শোওয়া হয়ে রয়েছে প্রভাতী, ড্রেসিং টেবিলের টুলটার ওপর বসে রয়েছে মহিম, এক হাতে মদ আর সোডা মেশানো গ্লাস, অন্য হাতে সিগারেট।

দৃশ্যটা ঠিক এই রকমই কল্পনা করেছিল রজত। একটু আগে যারা অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে রতি ক্রিয়ায় মেতে উঠবে না। রক্ত গরম হতে সময় লাগবে। বড় বড় চুমুকে মদ্যপান করে মহিম চাঙ্গা হচ্ছে। ওদের চাঙ্গা হবার এটাই একমাত্র উপকরণ।

রজত ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মহিম ভুরু কুঁচকে বলল, কে ? কী ব্যাপার ? কী চাই ?

রজত তাকে প্রস্তুত হবার কোনও সময়ই দিল না। হাতুড়িটা দিয়ে খুব জোরে আঘাত করল দুবার।

মানুষ প্রবৃত্তির বশেই হঠাৎ কোনও আক্রমণের মুখোমুখি হলে চোখ বাঁচাবার চেষ্টা করে, দু হাত দিয়ে মাথা ঢাকে। মহিম তার হাতের মদের গেলাশ বা সিগারেট কোনওটাই না ফেলে মাথাটা আড়াল করার চেষ্টা করল। সেই জন্য রজত তার মাথার ঠিক মাঝখানে মারতে পারল না, দুটো আঘাতই পড়ল মহিমের ঘাড়ে, মহিম একবার মাত্র আর্তনাদ করেই অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

রজত প্রভাতীকে বলল, তুমি চেঁচিয়ো না। তোমার আর ভয় পাবার কী আছে ?

একটা পাতলা ঝ্যালঝেলে সবুজ রঙের শাড়ি পরে আছে প্রভাতী। তলায় সাদা শায়াটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার ব্লাউজের রঙ ম্যাজেন্টা। মাথার চুল উঁচু খোঁপা করে বেঁধেছে, ঘাড়ের কাছে বেশ ময়লা, সেই ময়লার পরতে পরতে পাউডার। তার মুখখানা সুশ্রী নয়, হারিয়ে যাবার মতন। চোখের নিচে অনেক কান্না জমে আছে। আহা, বেচারা বোধহয় কাঁদতেও জানে না।

মেয়েদের সৌন্দর্য চর্চার ব্যাপারে রজতের কোনও জ্ঞানই নেই। কিন্তু বারো বছর ধরে তো বর্ণাকে দেখেছে। খুব দামি শাড়ি, বেশি গয়না কিংবা উগ্র প্রসাধনের দিকে বর্ণার একেবারেই ঝোঁক নেই। এক-এক সময় সে খুব সাধারণ ভাবে বেরিয়ে পড়ে, মনে হয় কোনও সাজগোজও করেনি, কিন্তু একটা স্নিগ্ধ শ্রী লেগে থাকে তার সর্বাঙ্গে। বর্ণাই একদিন বুঝিয়ে দিল, দামি শাড়ি বা গয়না নয়, সাজগোজের

www.BanglaBook.org

আসল ব্যাপার হল ম্যাচিং। কোনটার সঙ্গে কোনটা মানাবে। রজত বুঝতে পারল, সবুজ শাড়ির তলায় দেখতে-পাওয়া সাদা শায়া, ম্যাজেন্টা রঙের ব্লাউজ, ঘাড়ে পাউডার, এ সব খুবই চোখে লাগছে, বর্ণার পক্ষে এ রকম সাজ অকল্পনীয়।

এই প্রভাতী নামের মেয়েটি কেন বর্ণা হতে পারবে না ? শুধু তো দারিদ্র্য নয়, আরও কিছু আছে, ক্লাস, শ্রেণী। সেই শ্রেণী-বৈষম্য ! প্রভাতীর শাড়ি খানিকটা উঠে গেছে, তার দু পায়ের গোড়ালির কাছে বাঁধা মল। এ মেয়েটা যদি সত্যিই নাচতে জানত, তা হলে অফিস পাড়ায় ওকে ফুরনের কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করতে হত না।

হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে রজত আর একটা সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে। না নামিয়ে রাখলে হাতুড়িটা পড়ে যেত হাত থেকে। একজন আততায়ীর পক্ষে সেটা একদমই মানায় না। নিজেকে যতটা সংযত ও স্থির ভাবে রজত, আসলে সে ততটা নয়। ঘনঘন সিগারেট টেনে সে নিজের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

মহিম গুপ্ত মরেনি, এত সহজে ওদের জান যায় না। যে কোনও সময় আবার জ্ঞান ফিরে আসবে। রজতের ভেতরের জন্তুটা বলছে, মারো, মারো, দেরি করছ কেন, মেরে মেরে ওর মাথাটা ছাতু করে দাও, যাতে কোনওক্রমেই আর বাঁচতে না পারে। তারপর তুমি পালাও !

রজত বলল, হুড়োহুড়ি করার কিছু নেই, ওর জ্ঞান ফিরুক। ও জেনে যাক, কেন ও মরছে। ওর স্যাঙাতরাও জেনে যাবে।

রজতেরও এখন সবাইকে জানাতে দ্বিধা হবে না। গোপনীয়তা সে আর সহ্য করতে পারছে না। কুড়ি বছর ধরে একটা গোপন তার বুকের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফুলে-ফেঁপে বুক ফেটে বেরুবার উপক্রম হয়েছিল। এবার জন্তুটাও মুক্তি পাবে।

মায়ের কাছে গিয়ে বলবে, মা, আমি সত্যি সত্যি খুন করেছি। আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না। মানুষের মতন চেহারা হলেই মানুষ হয় না। কেউ কেউ অমানুষ হয়, এই মহিম নামের লোকটার নিশ্চয়ই বাল্যকালটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কারুর স্নেহ পায়নি, তাই পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। বাড়ির মধ্যে একটা-দুটো পচা আম থাকলে যেমন তুলে ফেলে দিতে হয়, তেমনই সমাজ থেকে এই সব লোকদের না সরালে সমাজটাই পচে যায়। আমি আগেও একটি খুন করেছি মা, ভুল মানুষকে, একজন নিরীহ ইস্কুল মাস্টারকে, তখন আমার বয়স কম ছিল, নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখিনি, শুধু

www.BanglaBook.org

একটা তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে উন্মাদনার ঘোরে ছুটছিলাম, ভুল হয়েছিল, অনেক ভুল হয়েছিল, এখন এই লোকটিকে মেরে কি আগের ভুলটার জন্য ক্ষমা পাওয়া যাবে না ? না, ক্ষমা কিংবা দয়া আমি চাই না, এটা কি আমার এক ধরনের ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্ত নয় ?

বর্ণা, এবার তুমি বুঝতে পারলে তো, কেন আমি সেই রাতে ডায়মন্ড হারবার রোডের এক হোটেলের সামনে একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম ! আমার সেই অল্প বয়সের খুনের কথা তোমার কাছে স্বীকার না করলে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যেত না। এখন আর আমার কোনও দ্বিধা রইল না। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়, এখন আর কোনও অস্পষ্টতা রইল না, তাই না ?

জগদীশ আচার্যর ছেলে খুন করতে পারে, তা অনেকে বিশ্বাসই করতে পারে না। এমন কি দ্বিজেন বাগচিও। রজতের ওপর তার এত বিশ্বাস ! এখনকার রাজনীতিতে ক্ষমতায় থাকতে গেলে খুন-জখম তো জল-ভাত। নেতারা পুলিশ কিংবা ক্যাডারদের দিয়ে যেমন খুন করায়, তেমনই নিজেরাও খুন হয়ে যাবার ভয়ে সব সময় পাহারাদার নিয়ে ঘোরে। জনগণের প্রতিনিধিরা সশস্ত্র প্রহরী না নিয়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। নিজেদের হাতে গড়া দৈত্যদের দমন করতে পারে না নিজেরাই। দ্বিজেন একটা অসহায় মেয়েকে কোনও রকমে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতা কিংবা সামাজিক সুবিচারের ভাব দেখাচ্ছিল। মহিম গুপ্তকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে আমতা আমতা করছিল। দ্বিজেন প্রভাতীকে বাঁচাতে চায়, কিন্তু প্রভাতীর মতন, সুকুমারের মতন বহু ছেলেমেয়েকে যারা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেই মহিম গুপ্তদের সরাবার সাধ্য ওদের নেই। এই ভাবেই ওরা টুটা-ফুটা গণতন্ত্রকে জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছে। দ্বিজেন, তুই দ্যাখ, তোর যে কাজটা করা উচিত ছিল, তুই মুখ ফিরিয়ে রইলি, সেটাই আমি করেছি। সেই সত্তরের দশকে আমার ভুল হয়েছিল, এ বার আমি ভুল করিনি।

প্রভাতী সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে হিম মুখে বসে আছে। রজতকে সে চিনতে পারা না-পারার মধ্যে রয়েছে। বিস্ময়ের চেয়ে ভয়টাই বেশি। ওর বাবা যখন নিহত হয়, তখন ও ছিল নিতান্তই বালিকা, ওর মনে আছে কি সেই ঘটনা ? আজকের ঘটনা ওর মনে থাকবে সারা জীবন।

সরাসরি ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি রজত। ওর দিকে চেয়ে আছে। একটা কিছু বলা দরকার। কত কথা থাকতে পারে, তবু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাচতে জানো ? কখনও নাচ শিখেছ !

প্রথমটায় যেন প্রভাতী বুঝতেই পারল না। তারপর খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, না।

রজত আবার জিজ্ঞেস করল, পায়ে মল পরেছ কেন ?

প্রভাতী মহিমের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ও বলেছে।

রজতের আর কিছু জানার দরকার নেই। সে দেখতে পেল একটা দৃশ্যের ঝলক। মাতাল অবস্থায় মহিম গুপ্ত একটি অনিচ্ছুক মেয়েকে নাচতে বাধ্য করছে।

শুধু এই জন্যই তো ওর মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত। রজত তাকাল মহিমের দিকে।

অপু, আমি তোর মৃত্যুরই প্রতিশোধ নিচ্ছি। তোর মৃত্যু আমি ব্যর্থ হতে দেব না। তুই বেঁচে থাকলে ঠিক যা করতিস, আমার হাত দিয়ে সেটাই হতে যাচ্ছে। সেই আমলে আমরা এক-একটা অ্যাকশনের আগেই পালাবার পথ ভেবে রাখতাম, যদিও শেষ পর্যন্ত পালাতে পারিনি। কিন্তু যে পালাবার কথা একেবারেই চিন্তা করে না, পৃথিবীর কোনও বাধাই তার কাছে বাধা নয়। সে যে কোনও অন্যায়কারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণ কনস্টেবল, কেরানি, ইস্কুল মাস্টার বা ছোট জোতদার নয়, আমি শাস্তি দিচ্ছি সত্যিকারের একজন অপরাধীকে। ওর ওপর আমার ব্যক্তিগত কোনও রাগ নেই, এই প্রভাতী নামের মেয়েটার ওপর আমার টান নেই, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে আমি ওকে আঘাত করতে এসেছি। কারণ ওর নাম মহিম গুপ্ত, ও এই সমাজের দূষিত মানুষগুলোর প্রতিনিধি। নুরুল, আমি ঠিক করছি না ? নুরুল, আমাদের সেই অল্প বয়সের ভুল এই ভাবে শোধরানো যায় না ? তোরা চলে গেছিস, আমার এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না। মনোজ, নিখিল, বিজয়দা, ইন্দ্রজিৎ...আমি তোমাদের সকলের হয়ে হাতে আবার অস্ত্র নিয়েছি। ব্যর্থ হয়নি, আমাদের কিছুই ব্যর্থ হয়নি, আমি ব্যর্থ হতে দেব না।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রজত। বাইরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির ছাঁট ধোঁয়ার মতন ঢুকে আসছে জানলা দিয়ে। আর কোনও শব্দ নেই। পৃথিবীতে যেন এখন আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। রজত দেখতে পাচ্ছে অসীম অন্ধকার মহাকাশে খুব ছোট ছোট অসংখ্য আলোর বিন্দু। সেই বিন্দুগুলোর কোনটা কোন দিকে ছুটে যাচ্ছে তার বোঝার উপায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে সাতটি রঙে, ঢেউয়ের মতন রঙ, শূন্যে উড়ে যাচ্ছে এক-একটা বৃহৎ গাছ, শিকড় ওপর দিকে, ডাল পালা নিম্নে, ডানা ঝটপটিয়ে পালাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, কোথা থেকে খসে পড়ছে রাশি রাশি বই, আবার সেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে বেগুনি থেকে লাল বর্ণের মধ্যে...

কারা যেন ডাকছে, বহু কণ্ঠস্বর, চেনা কণ্ঠস্বর, বাবা-মায়ের মতন, বর্ণার মতন, অপু, নুরুল ও অন্য বন্ধুদের মতন, আবার অনেক অচেনা কণ্ঠ, সবাই ডাকছে, রজত, রজত, খোকা, খোকা... ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG